নষ্টোদ্ধার

বা

বাংলার মেয়ে

(উপন্যাস)

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রকাশক—শ্রীশরৎকুমার হোড়,
শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির।
২৩।১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎকুমার হোড়
শ্রীগোবিন্দ প্রেস,
২৩।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

স্নেহভাজন শ্রীমান্ চন্দ্রকুমার মজুমদার

চির কল্যাণাস্পদেষু—

চন্দ্রবাবু, কর্ম্মপথের শেষের দিকে চলিতে চলিতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই সূত্রে কুমিল্লা জেলার সাথে খুলনা জেলার যে সামান্য একটু গ্রন্থি বদ্ধ হইল, যাহা এ বৃদ্ধ পরপার যাত্রী শেষের সম্বলের মতন আঁকুড়িয়া ধরিয়াছে।—তাহা মর্ম্মে প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। "নষ্টোদ্ধার" তোমাকে দেওয়ার উদ্দেশ্য,—যদি লেখকেরা ওপার পৌছিবার পরেও এ গ্রন্থ এ পারের কোন লোকের হাতে পড়ে, তখন সে ভাবিয়া ব্যস্ত হইবে, এত দূরে দূরে দুইটী অসম প্রকৃতির অসম বয়সের মানুষের মিশামিশি হইল কিরূপে? এই সঙ্গে আমার আশীর্ব্বাদ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা তোমার চিরকাল অক্ষুন্ন রহুক।

বিষ্ণুপুর। ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল।

তোমার মঙ্গলকামী—

গ্রন্থকার।

উপহার।



গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

১।	চারু চন্দ্র	(২য় সং)	১৲	টাকা
২।	অমৃতে গরল	(২য় সং)	১৲	,,
৩।	সুভদ্রা	(২য় সং)	১৲	,,
৪।	বন মালা	(২য় সং)	১৲	,,
৫।	পাপিষ্ঠা	(২য় সং)	৷৹	,,
৬।	লক্ষ্মী মেয়ে	(৬ষ্ঠ সং)	১৲	,,
৭।	লক্ষ্মী বউ	(৯ম সং)	১৲	,,
৮।	লক্ষ্মী মা	(৫ম সং)	১৲	,,
৯।	সতী লক্ষ্মী	(৩য় সং)	১৲	,,
১০।	স্বয়ম্বরা	(২য় সং)	১৲	,,
১১।	দীপালির বাজি	(নূতন উপন্যাস) ...	১৷৹	,,
১২।	বিষের বাতাস	,, ,, ...	১৷৹	,,
১৩।	কুলের বলি	(যন্ত্রস্থ)	১৷৹	,,
১৪।	জ্যাঠাই-মা	... ...	১৷৹	,,
১৫।	প্রখরা	... ...	১৷৹	,,

শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির
২৩৷১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

জ্যাঠাই-মা।

নূতন সামাজিক

উপন্যাস

প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রখরা।

নূতন সামাজিক

উপন্যাস

প্রকাশিত হইয়াছে।

কুলের বলি।

নূতন সামাজিক

উপন্যাস

যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

নষ্টোদ্ধার।



বক্তা—বিজয় সিংহ।

(১)

আমার নাম বিজয় সিংহ, একথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন আমি কোনও দুর্ভেদ্য দুর্গবিজয়ী রাজপুত ক্ষত্রিয় বীর। আমি নিতান্ত ডাল-ভাত খাওয়া বাঙ্গালী; বাংলার নিতান্ত অবিখ্যাত পিছনে পড়া এক পল্লীতে আমার জন্ম স্থান। আমি যেবার ভূমিষ্ঠ হই, সেইবার আমার মামার বাড়ীতে "বিজয় বসন্ত" যাত্রার গীত হইয়াছিল, তাই আমার দিদিমা আমার নাম বিজয় রাখিয়াছিলেন। সিংহ আমাদের বংশের উপাধি, আমরা গোষ্ঠিপতি কায়স্থ।

বাবার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে তাহা কৃষক প্রজাদিগের সঙ্গে জোতজমায় বন্দোবস্ত ছিল, হাজার খানেক মুনফা ছিল, বাবা ও কাকা দুই ভা'য়ে যাহা ভাগ করিয়া পাইতেন, তাহাতেই ভদ্রলোকের মত সংসার আগে চলিত। তার পর যখন কোর্ট, সার্ট, গেঞ্জি, সায়া, সেমিজ, ব্লাউস প্রভৃতির বাজার বসিল, তখন আর সিংহ বাড়ীর মান রাখিয়া সংসার করা চলিয়া উঠিতেছিল না। বাবা তখন পৈতৃক

গাঁতিটা নাড়িয়া ছাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। উকিলেরা পরামর্শ দিলেন, করবৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে, হাজার টাকার স্থলে ৩ হাজার পর্য্যন্ত মুনফা হইতে পারে। তবে আগে কিছু টাকা খরচের আবশ্যক। কাকা কিছু ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, সেই অল্প লেখা পড়ায়ই কলিকাতায় থাকিয়া চাকরী করিতেন। আরও ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, কলিকাতায়ও থাকিতেন, সুতরাং হিন্দু সমাজের খাতা হইতে নাম কাটাইয়া ব্রাহ্মদের তালিকায় নাম লেখাইয়া লইলেন। বাবার সঙ্গে তাঁহার মোটেই মিল ছিল না। কাকা বলিলেন, আমি মামলা খরচের টাকাও দিতে পারিব না—লাভও চাই না; সম্পত্তি সকলই আমি দাদাকে ইজারা দিতেছি, পাঁচশ টাকা আমার ভাগে পাওনা, আমি সন সন তিন শ টাকা তিন কিস্তিতে পাইলেই খুসি। দাদা সম্পত্তি বাড়াইয়া গোছাইয়া খাইতে পারেন ভালই। তাহাই হইল, বার্ষিক তিন শ টাকা মুনফা দিয়া বাবা কাকার অংশ ইজারা লইলেন। তারপর প্রজাদিগের সঙ্গে লড়াই বাধাইলেন।

প্রজারা একবারে বাঁকিয়া বসিল, তাহারাও উকিল বাড়ী যাইয়া আসিয়া থাকে। উকিল সেরেস্তায় কর্ষা জোতের কর বৃদ্ধি হইতে পারে এ পরামর্শ যেমন আছে, আবার তিন পুরুষে জোতের আবার করবৃদ্ধি কি, ও ত মকররি স্বত্ব এ পরামর্শও নজির রুলিং সমেত পাওয়া যায়; সুতরাং মোকদ্দমাই চলিল। প্রজারা খাজনা বন্ধ করিল, এদিকে মামলা খরচ। মহাজনের ঘর হইতে বাবাকে অনেক টাকা ধার করিতে হইল; উকিল বাবুরা বলিতেছেন, সব মামলায়ই ডিক্রি হইবে। ডিক্রী কতকটার হইলও, প্রজাদিগকে ডিক্রী হইলেও উকিল বাবুরা মালেকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে দেন নাই, আপিল করাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং বাবার ডিক্রীর টাকা আদায় করিতে বিলম্ব হইল।

এদিকে কাকার সেই ইজারার খাজনা মোটেই দেওয়া হইতেছে না। কাকা কয়েকবার তাগিদ করিয়া নালিস রুজু করিয়া দিলেন। বাবা ত ভয়ানক রাগিয়া গেলেন, ভাই হইয়া এই বিপদের সময়ে এমন কাজ করিল, আচ্ছা ওর মোকদ্দমায় আমি অস্বীকার জবাব দিব। অনেক দিন বাবা আইন আদালত ঘুরিতেছেন, অহিফেনের নেশার চেয়ে মামলার নেশা গুরুতর। বাবার সঙ্গে কাকার মোকদ্দমা দুই আদালত চলিল। আদালতে মাঝে মাঝে সত্যের পরাজয় ঘটিলেও এক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল। কাকা মহাশয় হাজার তিনেক টাকা ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে বাবার মহাজনেরাও নালিশ রুজু করিল। আমাদের তখন কিন্তু প্রজাদের কাছে অন্ততঃ দশ হাজার টাকার ডিক্রীর টাকা পাওনা রহিয়াছে। কিন্তু বাবার আদালত মন্দিরের পূজা দিবার মত অর্থ সংগ্রহ হয় না, সুতরাং দেবতাপ্রসাদ ন্যায্য প্রাপ্য হইলেও পাইবার সামর্থ্য নাই।

তখন মা আমার দুই বৎসর রোগে ভুগিয়া একবারে শয্যা লইয়াছেন। যাহা কিছু যোড়ে আদালতের পূজাই লাগে, মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় না। আমি সেবার গ্রাম্যস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছি, মায়ের অবস্থা দেখিয়া বাবার সঙ্গে পুত্রের যাহা করণীয় নয়, এমন ভাবে কলহ করিলাম। তারপর মাকে লইয়া হাঁসপাতালে আসিলাম। রোগ চিকিৎসার তখন আর সময় ছিল না, রোগ-তাপ-দুশ্চিন্তা-ক্লিষ্ট জননীর জীর্ণ অস্থি মা গঙ্গা গ্রহণ করিলেন।

মা-হারা হতভাগ্য আমি আর দেশে ফিরিলাম না, কাকার কাছে গিয়াছিলাম, তিনিও স্থান দিলেন না। তাঁহারও তখন বড় বিপদ, তিন তিনটী কন্যাকেই লেখাপড়া শিখাইয়া সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাজে কন্যার বিবাহ না দিলে জাতি যায় না। কিন্তু আমার

ভগিনী তিনটীই কুমারী জীবনে ভারাক্রান্ত, স্ব স্ব প্রিয়জন পাইয়া প্রেমাকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিণয় সূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। সে সমাজে নাপিত পুরোহিতের দাবি না থাকিলেও, ছোট খাটো বিবাহের আয়োজন হাজার টাকার কমে হইতে পারে না। কাকার টাকার অসদ্‌ভাব। এ সময়ে আমাকে দেখিয়া, ও বাবার ব্যবহার মনে পড়িয়া তিনি মা-মরা ভ্রাতুষ্পুত্রকেও বাড়ীতে স্থান দিলেন না।

যা হউক, বাবারও অদৃষ্ট ভাল, সেই বৎসরই কয়েক দিনের জ্বরেই দেহত্যাগ করিলেন। বাবার রোগের খবর পাইয়াও বাড়ীতে যাই নাই, মৃত্যু সংবাদ পাইয়া না যাইয়া পারিলাম না। যাইয়া দেখিলাম, পিসিমা আসিয়া বাড়ী ঘরের পাহারা দিতেছেন।

মায়ের শ্রাদ্ধ গঙ্গার কূলে করিয়াছিলাম, বাবার শ্রাদ্ধ দেশে বসিয়া জলে-ফুলে করিলাম। ঠিক তখনই কাকা মশাই তাঁহার 'ডিক্রিজারি দিয়া বিষয় নিলামে চড়াইলেন। মহাজনেরাও তাহার সঙ্গে যোগ দিল। আমি তাহার প্রতিরোধের আর কি চেষ্টা করিব। পিসিমাকে বাড়ীতে রাখিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

এক সদাশয় ধনবানের গৃহে তাঁহার দুইটী শিশু ছেলে পড়াইয়া, আমি কলেজে পড়িতে লাগিলাম। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, পড়াশুনা করিয়া কৃতবিদ্য হইব, তাহার পর বড় চাকরী করিয়া বড় লোক হইব। টাকা করিবই, আমার প্রাণ-পণ প্রতিজ্ঞা।

(২)

মাঘের শেষ, সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে, সঙ্গে কন্‌কনে বাতাস; রাত্রিটাকে নিতান্ত বিশ্রী ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্ব-প্রাণ-শক্তি-সঞ্চারিণী প্রকৃতি আজ কি পীড়াদায়িনী নির্দ্দয় মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছেন! এত বড় কর্ম্মব্যস্ত কলিকাতা সহর, তাহাও যেন আজ পঙ্গু, কোনও প্রকারে মুড়িশুড়ি দিয়া তাহার সজীবতা বজায় রাখিয়াছে।

রাত্রি দশটা বাজে, সাতটায়ই আজ রাস্তায় চৌদ্দ আনা লোক চলে নাই, দশটায় আর কে বাহির হইবে। তবু দুই একখানা গাড়ি জুড়ি চলিতেছে, তখন এতটা মটর বাসের ভিড় হয় নাই। পাহারাওয়ালারা বর্ষাতি মুড়ি দিয়া ঝুল বারাণ্ডার দিকে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু শীতের কম্পন অপেক্ষা তাহাদের কর্ত্তব্য লঙ্ঘন জন্য ভয় ও উপরওয়ালার নজরে ধরা পড়িবার ভয়ের কম্পন তাহাদিগকে মোটেই স্বস্তিতে থাকিতে দিতেছে না। ভিজা পুরাতন জুতা জুড়ি পায়ে, ছিটের কোটের উপর ছিন্ন র‍্যাপার খানি জড়াইয়া আমি বউবাজার হইতে হুরি লেনে পড়িয়াছি। তখন আমি বড় দুরবস্থায়। বি, এ ফেল করিয়াছি, অত কষ্টে কি পড়াশুনা যায়? আমার মতন পুঁজিপাটা-হীন কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে বেলেঘাটায় একটা গোলপাতার মেটে ঘরে থাকি, নিজেরাই রান্না করি। সকালে ঐ বেলেঘাটায়ই একটা ছেলে পড়াই, আট টাকা মাইনে পাই। সন্ধ্যার পরে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে আর একটী ছেলে পড়াই, দশ টাকা মাসহরা। সকালে বিকালে আমার সময় হয় না। আমার সহযোগীরা দশটায় কাজে যান, আমি তখন সময় পাই, বাসার বাসন

মাজা এটো ঝাট্ দেওয়া প্রভৃতি সারিয়া, জল তুলিয়া বাজার করিয়া, তরকারী ছাড়াইয়া আমি রাখিয়া আসি। তাঁহারা রান্না করিয়া আমার ভাত ঢাকিয়া রাখেন, আমি যখন যাই, তখন খাই। এমনি ভাবে আমার এক বৎসর কাটিতেছে, সুবিধামত চাকরীর সংগ্রহ কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। তবে রেলের ছোট সাহেব আশা দিয়াছেন, মার্চ্চ মাসে ৪৫৲ টাকার একটা চাকরী তিনি দির্তে পারেন, কিন্তু শতখানেক টাকা তাঁহার প্রণামী দিতে হইবে। তাইত ভাবনা, পিসিমাকে মাসে মাসে ৩টী করিয়া টাকা দিতে হয়, তিনি পৈতৃক বাড়ীটী আগ্‌লাইয়া আছেন। তবু সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতায় গোটা পঞ্চাশেক টাকা হইয়াছে। যাহা হয়, এক রকম করিতেই হইবে। যে কোনও প্রকারে ডিপার্টমেণ্টে ঢুকিতে পারিলেই আমার উন্নতি, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

আজ শরীরের প্রতি প্রকৃতির এই বৃষ্টি বাদলের অত্যাচার, মনের উপরও অত্যাচার কম যায় নাই। যে বাড়ীতে টিউশনি করিতাম, তিনি আদালতের এটর্নি, বড় হুসিয়ার লোক। পর মাসের পনর দিন না হইলে পূর্ব্ব মাসের বেতন দিতেন না। আজ আমার টাকার বড় দরকার ছিল। একজুড়ি জুতা কিনিতে হইবে, একটা গরম জামা বা একখানা র‍্যাপার না কিনিলে আর চলে না। তাই বাবুর কাছে বড় কাতরে জানাইলাম, আমাকে পূর্ব্ব মাসের দশটী টাকার সঙ্গে এ মাসের অন্ততঃ ৫টী টাকা আজ দিয়ে দিন, আমার বড় অভাব।

বাবু তাহাতে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। দরিদ্রদিগের কথা ও কার্য্য কতটা মোলায়েম হইলে ধনবানদিগের স্বস্তির বাধা পড়ে না, তাহা দরিদ্রেরা দায়ে পড়িয়া সর্ব্বদা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, ইহাই কিন্তু দরিদ্রদিগের দুর্গতির প্রধান কারণ হইয়া উঠে। বাবু বলিয়া উঠিলেন,

"তোমার মত বেয়াদব ছেলেত দেখি নাই বাপু! আজ এই দুর্যোগ, এর মধ্যে তোমার টাকা চাই, তা আবার পাঁচ টাকা আগাম! তুমি ত প্রত্যহ দশ মিনিট আগে থাক্‌তে চলে যাও, এমন কল্লে পোষাবে না বাপু।"

আমি তবু কাতরে বলিলাম, "আজ্ঞে না, আমি সময় হলেও দশ মিনিট পরে যাই, আমিত বলেছি, যদি রাত্রিতে এখানে একটু থাক্‌বার যায়গা পাই, তা হ'লে আটটার সময়েই আমি খেয়ে এসে এগারটা পর্য্যন্ত পড়াতে পারি।"

বাবু তখনই অমনি বলিলেন, "না না, সে হবে না থাক্‌বার যায়গা টায়গা মিল্‌বে না। ছোট লোক টোক বাড়ীতে যায়গা দেওয়া ভয়ানক ঝক্‌মারি।"

তখনও ধৈর্য্যের বাঁধটা আমার অভাবের ভাবনা দিয়া আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম, বলিলাম, "আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু ছোট লোক নই, তা বোধ হয় আপনি জানেন।"

"আরে বাপু, ছোট লোককে চেনা, দেবতারও অসাধ্য, মানুষ ত কোথায় লাগে।"

"আপনারা টাকার ওজন দিয়ে মানুষের মানের মাপ করেন, এটা আপনাদের ভুল।"

"আরে মশাই, তুমিত তর্কবাগীশও কম নও।"

"তা যা'ক, তর্কে কাজ নাই, আমার টাকা ক'টা দিয়ে দিন, আমার দরকার।" এবারকার কথাটা আমার বুদ্ধির অগোচরে অন্তরাত্মা বোধ হয় একটু চড়া সুরেই বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

কর্ত্তা তখন বিষম ক্রোধে গায়ের চোসাখানা সরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই ত, তুমি ছোট লোক না ত বড় লোক? আবার এখনই তোমার টাকা, বল্লাম যে আজ না, আর এক দিন নিও।"

আমি বলিলাম, "না মশাই, আজ আমার চাই, বেশী না হয়, আমার আগেকার মাসের ডিউ হয়েছে, দিয়ে দিন।"

"মলো যা, আমি বল্‌ছি, এত শীতে হবে না, তা আবার ডিউ টিউ কি ? কে যাবে এখন বাক্‌স খুলে টাকা দিতে ?"

"আর দেখ্‌তে ত পাচ্ছেন, আমি এই খালি গায়ে বেলেঘাটা পর্য্যন্ত যাই আসি। আমি আর আপনার ছেলে পড়াবো না, কাল আস্‌বো, আমার যা পাওনা চুকিয়ে দেবেন, আপনি অন্য মাষ্টার দেখুন।"

উপরের সিড়ি দিয়া নামিয়া নীচে আসিলাম, পিছন হইতে খান্‌সামা ডাকিল, "শোন, শোন, ম্যাষ্টার শোন।"

ফিরিয়া বলিলাম, "ক্যা বোল্‌তা ?"

খানসামা বলিল, "মা জি বোলাতা।"

খানসামার সহিত আবার উপরে উঠিলাম। বাড়ীর গৃহিণী আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "ম্যাষ্টার ? তুমি নাকি খোকাকে আর পড়াবে না।"

আমি তেমনি রুক্ষ কণ্ঠেই বলিলাম, "না, আমি আর পেরে উঠ্‌ছি না।"

"তুমি কি প্রত্যহ বেলেঘাটা থেকে এসো, আর এই রাত্রি দশটায় ফিরে যাও।"

"তা বই আর কি ? আমরা যে দরিদ্র, ছোট।" নারীর কণ্ঠে যে সহানুভূতি স্নেহের কোমলতা প্রচ্ছন্ন ছিল, সে উত্তেজনার সময়ে তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই।

গৃহিণী বলিলেন, "বোস তুমি, তোমার এত কষ্ট ? কাল থেকে তুমি এইখানেই থাকতে পার, তার ব্যবস্থা আমি করবো। কর্ত্তার অমনিই ভাব, ওঁর উপর রাগ করো না, খোকা তোমারইত ছাত্র, ওর অকল্যাণ করো না। এই নাও আমি দিচ্ছি তোমার দু'মাসের মাইনে এই কুড়িটা

টাকা, আর এই টাকাটার আট আনা পয়সা দিয়ে একখানা গাড়ি চড়ে বাসায় যেও, আর দোকান থেকে কিছু গরম খাবার কিনে খেতে খেতে যেও।”

গৃহিণী কথার সঙ্গে কাজগুলিও করিয়া গেলেন, আমি কোনও কথা বলিবার অবসর পাইলাম না। বিনা প্রতিবাদেই রাস্তায় বাহির হইলাম। স্থির লেন ছাড়াইয়া বড় রাস্তায় নামিয়াই গাড়ি করিব, কিন্তু এতবড় হৃদয়হীন গৃহস্থের এমন দয়াশীলা গৃহিণী হইলেন কিরূপে? আবার ভাবিতেছি, এই ইট পাথরের সমুদ্র কলিকাতা সহরে হৃদয় বলিয়া কোনও কোমলস্পর্শের বস্তু ত এ পর্য্যন্ত আমি পাই নাই। তবে ইহাও ঠিক, এমন কিছু পবিত্র মহত্বের মসলা না থাকিলে এ লক্ষ্মীর লীলাস্থান মহানগরীর শোভার গাঁথুনী কখনই টিকিয়া থাকিতে পারে না। আজ পুরাতন কথা কিছু কিছু মনে আসিল, এমনি অবস্থায়ই লোকের চিত্তে তরঙ্গ উঠা স্বাভাবিক। ভাবিলাম, এইখানেই ত বিদ্যাসাগর ভূদেবের শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষেত্র। এইখানেই কেহ আট টাকায় বিস্কুটের ব্যাপারী হইয়া ক্রোড়পতি, কেহ রাস্তায় বটতলায় কেতাব ফেরি করিতে গিয়া লক্ষপতি। আবার কেহত লক্ষ টাকার হৌসের মালিক হইয়া পথের ভিখারী। এখানে জয় পরাজয় দুই-ই আছে। ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনস্ক ভাবে পথ চলিতেছি, হঠাৎ একজন লোকের গায়ে ধাক্কা লাগিল। ধাক্কা লাগিয়া লোকটী পড়িয়া গিয়া “বাবা গো” বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দেখিলাম একজন বৃদ্ধা। তিনি কোনও বড়লোকের বাড়ীতে পাচিকার কাজ করেন, রাত্রিতে রন্ধনাদি সারিয়া, থালা বাটীতে ভাত ব্যঞ্জন লইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। এ দুর্যোগ রাত্রিতে পথ চলিতে তাঁহার অবশ্য বড়ই কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু দায়ে পড়া লোকের দুঃখ কষ্টের আবার মাত্রা কি? বৃদ্ধা যেমন গলির মোড়

ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, অমনি আমার ধাক্কা লাগিয়া তিনি পড়িয়া গিয়াছেন। আমি বৃদ্ধাকে ধরিয়া তুলিলাম, দেখিলাম তাঁহার হাতের কনুইটা একটু কাটিয়া গিয়াছে, ভাত তরকারীগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মরণাধিক লজ্জা ও দুঃখ হইল, কিরূপে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? বড় কাতরে, প্রাণের অকপট ভক্তিভরে, সত্যিকার দেবতার কাছে ভক্তের নিবেদনের মত বলিলাম, "মা! আমি দেখ্‌তে পাই নাই।"

বৃদ্ধা কম্পিত কণ্ঠে অতি কষ্টে বলিলেন, "দেখ্‌তে ত পাও নাই, বাছা, মেয়েটা আজ না খেয়ে থাক্‌বে। তুমি কি জাত বাছা?"

বৃদ্ধা যেন একটুও ক্রুদ্ধ হন নাই, এ যেন তাঁহারই ভাগ্যলব্ধ দুর্ঘটনা, আমার যেন ইহাতে কোনও দোষই নাই। এতবড় ক্ষমা মানুষের থাকে?

আমার কান্না আসিল, বলিলাম, "আমি কায়েস্থ"। বৃদ্ধা বলিলেন, "তবে দেখত, উপর উপর চারটী ভাত যদি তুলতে পার। ডালের বাটীটে ত ঠিকই আছে।"

আমি বলিলাম, "না মা ভাত আর তুলে কাজ নাই, চল মা আমি তোমায় গৃহে রেখে আসি।"

আমি থালা বাটী দুটী কুড়াইয়া তুলিয়া লইলাম। গায়ের র‍্যাপার খানি খুলিয়া বৃদ্ধার গায়ে জড়াইয়া দিলাম, এ ছাড়া ত আর আমি করিবার মতন কিছুই পাইলাম না। বৃদ্ধা বলিলেন, "আহা কর কি বাছা! তোমার যে কত কষ্ট হবে?"

আমি কিছু বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না। সত্যই সেই দুরন্ত মাঘের বাদলার রাত্রিতে আমার গায়ে তখন ঘাম ছাড়িয়াছে! সেই গৃহস্বামীর সঙ্গে তর্ক করিতে শরীরে তাপ ছুটিয়াছিল, সেই তাপ আরও

বাড়িয়াছিল, যখন দয়াবতী গৃহস্বামিনী আমাকে ডাকিয়া স্নেহের পরশে আমার মনকে তাতাইয়া দিয়াছিলেন,—মানুষের মন ভাবের বশেই তাতে, সে ভাব কঠোরই হউক আর কোমলই হউক। আর এইবার আমার মন হইতে, শরীরের অতি অভ্যন্তর হইতে যে তাত বাহির হইয়াছে, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ বৈশাখের রৌদ্র স্পর্শবৎ উত্তপ্ত করিয়া দিয়াছে। কেবলই ভাবিতেছি, এত বড় মহাপাপ কেন করিলাম? বুড়ী যদি ইহার জন্য আমাকে দুটী গালি তিরস্কার কথা বলিতেন, একটা ছোট অভিশাপের কথাও ফুটিয়া বলিতেন আমার বোধ হয় এতটা কষ্ট হইত না। বৃদ্ধাকে লইয়া সারপেণ্টাইন লেনে একটা বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই বাড়ীটার কোণের একটা ঘরে ধাক্কা দিতেই, ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। একটী মেটে প্রদীপের আলো হাতে একটী দশ বারো বছরের মেয়ে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা ঘরে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া, আমি কথাটী না বলিয়া কালবিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া আসিয়া নিকটেই একটা খাবার দোকানে আসিয়া সেই আট আনার খাবার কিনিলাম। সেও আমার দয়ার দানে পাওয়া,—সেই পবিত্র দানে পাওয়া বস্তু আজ এমন অতি পবিত্র বিষয়ে লাগাইতে পারিলাম ভাবিয়া মনে মনে বড় প্রসাদই জাগিল, আবার কিন্তু ভয় হইল, এ বস্তু যদি তাঁহারা গ্রহণ না করেন। বৃদ্ধাকে যে আমি বড়ই মহনীয়া চরিত্রের দেখিলাম। খাবারটা লইয়া আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলাম, শুনিতে পাইলাম তাঁহারা দুইজন আমারই কথা বলিতেছেন, আমার উপর একটুও বিরাগের কথা নয়। বৃদ্ধা বলিতেছেন, "ছেলেটার দোষ কি? যে দুর্যোগ রাত্রি, আমি মোড় ফিরে আস্‌তেই তার গায়ের উপর পড়েই ত পড়ে গেছি। বড় ভাল ছেলেটি, আহা কি করেছে দেখ, তার র‍্যাপারখানা আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল, তাত নিয়েও

যায় না। কোথাথেকে ছেলেটী কথাটী না বলে পালিয়ে গেল? বড় লজ্জা পেয়েছে, তার গায়ের র‍্যাপারখানা দিয়ে চলে গেল? আহা কি অন্যায়, তাকে আর কোথায় পাব যে র‍্যাপারখানা ফিরিয়ে দেই? না পাই তুই গায়ে দিস্ বোন্।"

কথাগুলি আমার কর্ণে অমৃতের মত মিষ্টও বোধ হইতে লাগিল, আবার আমি যে এত মিষ্ট ব্যবহারের মোটেই যোগ্য নই ভাবিয়া মনটার বেশ আঘাতও লাগিতে লাগিল। বৃদ্ধার কথায় আর একটী বালিকা বলিল, "তিনি দয়ালু হতে পারেন, কিন্তু এমন ভাবে চুপে পালিয়ে যাওয়া তাঁর উচিত হয় নাই। আছি নয় আমরা গরিব অবস্থায়, দু'দণ্ড বসে একটু বিশ্রাম কর্‌বার মতন যায়গা অবশ্যি আমরা দিতে পাত্তাম্।" স্বরটী মিষ্টও বটে, অকপট হৃদয়গ্রাহীও বটে, তাহাতে আবার দারিদ্র্য জনিত একটু ব্যথামিশ্রিত! আমি দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিলাম, "দ্বারটা খুলুন।"

বালিকা খুব উৎসাহেই বলিল, "ঐ ত, ঠাকুরমা তিনি যান নাই, আহা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছেন।"

বালিকাই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরখানি নেহাৎ ছোট নয়, একজন বালিকা ও বৃদ্ধার থাকিবার পক্ষে যথেষ্টই। ঘরে ঢুকিয়াই চৌকির উপর পাতা বিছানার উপর বসিয়া পড়িলাম। খাবারের ঠোঙ্গাটা বালিকার হাতে দিতে বালিকা হাত বাড়াইয়া লইল, উপরের ঢাক্‌নির পাতাটা তুলিয়া বলিল, "ও মা, এত খাবার কি হবে?" বৃদ্ধা বলিলেন, "আহা! একি করেছ বাবা? না দেখে একটা কাজ হয়ে গেছে, তার জন্য কি এত কর্ত্তে হয়?"

"এমন কর্লে আমরা যে লজ্জা পাব, তা উনি বুঝ্‌তেই পারেন নাই বলিয়া বালিকা আমার প্রতি নিঃসঙ্কোচেই চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা হোক্, মাধবী তুই থালাখানা টেনে, খাবারগুলি অর্দ্ধেকটা সাজিয়ে ছেলেটীকে দে, আর অর্দ্ধেক তুই খা।"

মাধবী যেন কত খুসী হইয়াই চৌকির নিম্ন হইতে একখানা থালা তুলিয়া আনিল। এর আগে তার মুখে যে সমস্যা নিরাকরণ চিন্তায় ঘোরাল সন্দেহ ভাবের রেখা পড়িয়াছিল, তাহা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই কাটিয়া গেল, মুখখানা তাহার নিতান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জ্যোতিতে যেন হাস হাস বোধ হইল। প্রদীপটা আরও টানিয়া কাছে লইয়া, মাধবী ছোট হাতখানিতে থালার উপর খাবার সাজাইতে লাগিল। খাবার সাজাইতে সাজাইতে বলিল, "এ কচুরীগুণ একবারে বাসী, বিশ্রী হয়ে গেছে, এগুণ বাবুকে দেবো না মা, কি বলো, খারাপ জিনিষ খেয়ে অসুখ কর্ত্তেও ত পারে?"

আমি এ পর্য্যন্ত কোনও কথা বলিবারই অবকাশ পাই নাই। অত বড় দুর্য্যোগের মধ্যে, এই এগারটা রাত্রি পর্য্যন্ত এক পয়সার ডাল'বাদাম মাত্র জলপানি খাইয়া, তিন ঘণ্টা ছাত্র পড়াইয়া এত পথ হাটিয়া আসিয়াছি, তাহার পর ভাবনা চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতও কিছু গিয়াছে! বসিয়া একটু শ্রান্তি দূর করিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু এই বালিকা ও বৃদ্ধার ব্যাপার দেখিয়া মনটা বিশেষ অস্বস্তি বোধই করিতে লাগিল। কিন্তু জবাবটা কি দিব, তাহা ঠাওর করিতে খুবই বিলম্ব হইয়া গেল, আবার উহারা আমার জবাবের প্রতীক্ষাই করিতেছে না। খাবার সাজাইয়া, বালিকা বৃদ্ধার কাণের কাছে আসিয়া চুপে চুপে বলিল, "হ্যাঁ মা! বাবু বামন ত নয়, আমাদের হাতে খাবেন?"

কথাটা চুপে চুপে বলিলেও আমি শুনিয়া ফেলিলাম, এবং কথাটার উত্তর দিয়া ফেলিলাম, "না না আমি বামন নই।" কথাটা বলিয়াই আমার হুস্ হইল, একি করিলাম? আমি যে ভাবিতেছি কিরূপে

এখানে বসিয়া এ খাবারটা না খাইয়া পারি? কথাটা যাহা বলিলাম, তাহাতে যে আমার খাওয়া বিষয়ে সম্মতিই দেওয়া হইল। তাই আবার বলিলাম, "কায়স্থ হলেই কি সকলে সকলের হাতে খায়?"

মাধবীও কথার জবাব দিল, "আমাদের হাতে সকল কায়স্থেই খেতে পারে, আমরা বরং সকলের হাতে খেতে পারি না, কেমন নয় মা?" কথাটা বলিয়া বালিকা খুব হাসিয়া ফেলিল।'

"দেখ, মাপ কর, রাত্রি অনেক হয়েছে, এরপর গাড়ি পাওয়া যাবেনা, আমি বেলেঘাটা পর্য্যন্ত যাব।" বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

বৃদ্ধা বলিবেন, "ওমা, বেলেঘাটে যাবে? এই রাত্রে! তা কতকটা খাবার তুমি খেয়ে যাও, আজ রেতে তুমি ভাত খেয়েছ?"

এ কথার জবাব মাধবীই দিল, বলিল, "কিছুতেই নয়। এই শীতের রাত্রে খেয়ে দেয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয়?"

বালিকা সেই ঘরের মেজে একখানি আসন পাতিয়া, এক গ্লাস জল রাখিয়া, সহজেই ডাকিল "আসুন।"

তবু আমার সঙ্কোচ যায় না। বলিলাম, "এখন এতগুন খাবার খেলে ত ভাত খেতে পারবো না, সেগুলি অনর্থক নষ্ট হবে।"

"আর এগুলি এখানে পড়ে সার্থক হয়ে যাবে? ভাত নিয়ে বসে আছেন বোধ হয় আপনার মা, আর যদি বউ থাকেন সে ত আমারই মতন ছেলে মানুষ। ভাত যদি না খেতে পারেন, তবে বলবেন, এক গরিব বুড়ীর ভাত ফেলে দিয়েই এই বিপদ।" বালিকা আরও কত হাসিল! সত্যই বালিকাটী দেখিতে বড় সড় হৃষ্ট পুষ্ট হইলেও বয়সে একবারেই বালিকা।

খাইতে বসিলাম। আস্তে আস্তেই খাইতে লাগিলাম। তাড়াতাড়ি খাইয়া সরিয়া পড়াই ভাল ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তেই খাইতে লাগিলাম।

বালিকা বলিল, আমি কিন্তু ঠিক আদ্দেক ভাগ করে দিয়েছি, কিছু ফেলে যাবেন না কিন্তু।" আমি বলিলাম, "তুমি খাচ্ছ কই?"

"এই ত খাচ্ছি" বলিয়া বালিকা আর একখানি ডিসে তোলা অবশিষ্ট খাবারটা চৌকির উপর বসিয়াই খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে সে বলিল, "এ খাবারগুলি এনে আপনার অনেক পুণ্যি হয়েছে। আমি মুঁড়ি খেয়ে থাকৃতুম্, মিঠাই খেতে পেলুম, সে জন্য পুণ্যি ত আছেই, তার উপর আবার ময়রা দাদার বাসি মালগুলি বিকিয়ে গেল। এ পাড়ায় দু'চার পয়সার খদ্দেরই মেলে, একদম এক টাকার খদ্দের ত সকল দিন তার মেলেই না।"

মেয়েটা বকাটেও মন্দ নয়, কথাগুলি বেশ মিষ্ট সন্দেহ নয়। আমি বলিলাম, "এক টাকা তোমায় কে বল্লে? এ যে মোটে আট আনার খাবার।"

"নিশ্চয়ই না, আট আনায় এত খাবার দেয়?"

"আমি কি তবে মিথ্যাবাদী?"

একথায়ও মাধবী লজ্জিত হইল না, বলিল "আমরা বেশী করে লজ্জা পাব বলে, আপনি কম করে বল্‌তেও পারেন, তাতে কি আর মিথ্যাবাদী হয়ে গেলেন? আট আনার বেশী হ'বে, নিশ্চয়ই।"

আমি তখন সত্যকথা বলাটা নিতান্ত প্রয়োজনই মনে করিলাম, "বলিলাম, সব শুদ্ধ সাড়ে দশ আনা লেগেছে!"

বৃদ্ধা এতক্ষণে লেপটা টানিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন তিনি বলিলেন, "এতগুন পয়সা নষ্ট করেছ বাপু! তুমিও যেন গরীবের ছেলে বোধ হচ্ছে।"

আমার কিন্তু তখন ইচ্ছা করিতেছিল, আমার সত্যিকার পরিচয়টা ইহাদিগকে দিয়া দেই। অন্তত আজ যে উপায়ে একটা টাকা মেহের

দান স্বরূপ পাইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা না পাইলে ইচ্ছা থাকিলেও আমি অতি কর্ত্তব্য কাজটাও করিতে পারিতাম না, বিষয়টা ইহাদের কাছে খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাই কি বলা যায়?

খাওয়া শেষ হইল; সবগুলিই খাইলাম। কেবলমাত্র একটা রসগোল্লা মাধবীর পাতে তুলিয়া দিতে মাধবী কোনও আপত্তি করিল না। এদিকে বৃষ্টি যে আরও জোরে পড়িতেছে, তাহা লক্ষ করি নাই, বাতাসও জোরে বহিতেছে। দ্বার খুলিতেই ঘরের দীপটী নিবিয়া গেল। মাধবী তখনই আবার দীপ জ্বালিল। খুব যেন চিন্তিত হইয়াই বলিল, "তাই ত, কেমন করে যাবেন?" আমিও বলিলাম, "তাই ত, কি করা যায়? রাত্রি সাড়ে এগার বাজে।"

মাধবী বৃদ্ধাকে বলিল, "মা, বাবু বাড়ীতে যাবেন কেমন করে, ভয়ানক ঝড় জল হচ্ছে যে।"

মাধবী বলিল, "তবে আমি উপরে গিয়ে ঝির সঙ্গে শুই গিয়ে, বাবু এই বিছানার পাশেই শুয়ে পড়ুন। আর কি করা যায়?"

বৃদ্ধা বলিলেন "এত রাত্রে উপরে গিয়ে ডাকাডাকি করলে এঁরা কত বিরক্ত হবেন! হয় ত উঠ্‌বেই না।"

"তাই ত কি করা যায়?" মাধবীর মুখে যেন কত বড় মুস্কিলের ভাবনার ছায়া পড়িল। আমি বলিলাম, "যাক্‌গিয়ে, বেরিয়ে পড়ি, একখানা গাড়ি ডেকে চলে যাই।"

মাধবী খুব খিন্ন কণ্ঠেই বলিল, "তাই ত, না গেলে আপনার মার কত ভাবনাই হবে।"

এখন আমি কথার পৃষ্ঠে কথা খুব তাড়াতাড়ি বলিতেছি, বলিলাম, "মা বোন্ আমার ইহকালে কেউ নাই, একটা বাসায় থাকি।"

মাধবী বলিল, "তবে, মা এই নীচেয় দুটী কম্বল পেতে ছোট একটু বিছানা করে দেই, বাবু এখানে শুন্, তুমিত আর এখন নেমে নীচেই আস্তে পারবে না, নইলে আমরাই না হয় নীচেই শুতুম। এই দুর্য্যোগে রাস্তায় পড়ে মারা পড়ার চেয়ে এটা মন্দ হবে না। কি বলেন ?"

কথাটা তখনকার মত এমন সত্য যে তার উপর আর প্রতিবাদ চলে না। এ দুর্যোগে এমন সময়ে ঘরের বাহির হইলে, যমের হাতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেলেও পাহারাওয়ালার হাতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। তবু বলিলাম, "তোমাদের ভারি কষ্ট হবে।"

বালিকা তখন বিছানাই পাতিতেছিল, বলিল "ঘরে বসে একটু বিছানা পাতার কষ্ট, আর বাইরে পড়ে ঝড় জলে মারা পড়া, অবশ্য সমান হ'তে পারে না। নিন্, শুয়ে পড়ুন। রাত্রি অনেক হয়ে পড়েছে।"

শুইয়াই পড়িলাম, বালিকা দীপটী নিবাইয়া বৃদ্ধার কাছে গিয়া শুইয়া পড়িল, উহারা শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল, বৃদ্ধার নাক ডাকিতে লাগিল, বালিকারও নিশ্বাসের শব্দে-বোঝা গেল, সে গাঢ় নিদ্রায় বিভোর। আমার কিন্তু নিদ্রা আসিতেছিল না। মনে অনেক বাজে ভাবনা একটার উপর আর একটা বাহিরের হাওয়ায় তরঙ্গের মত আসিয়া মনটাকে যেন ঝাপটে ঝাপটে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ভাবিলাম এ আবার কি ঘটিল ? আজকার দিনটার কি একটা দৈবশক্তি আছে ? ইহাদের পরিচয় ত কিছু জানিলাম না, জানিবার সময় পাইলাম কই ? বহুভাষিণী এই বালিকাটার কথার উত্তর দিয়াই পারিলাম না। এত সকালে না ঘুমাইয়া, আরও কিছুক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া, ইহাদের পরিচয়টা জানিয়া নিলেই হইত।

রাত্রি কাটিল, ভোরে জাগিয়াই শয্যায় পড়িয়া রহিলাম, ইঁহারা না উঠিলে, একবার না বলিয়াই বা যাই কি করিয়া।

মাধবীই আগে উঠিল। ডাকিল, "মা! ও মা! ঠাকুর মা?"

এইবার বুঝিলাম বৃদ্ধা মাধবীর মা নন্, ঠাকুরমা। এ সন্দেহটা অনেকবারই মনটা ব্যস্ত করিতেছিল। ঠাকুরমা উঠিলেন, সেই সঙ্গে আমিও উঠিয়া পড়িলাম। মাধবী একটা ঘটিতে একঘটি জল ও গামছা আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "যান, নীচের পাইখানা খালি আছে, পাশেই কল, স্নান কর্ত্তেও পারেন।"

আমার বিড়িটা সিগারেটটা খাওয়ার অভ্যাস ছিল, কাছে ম্যাচ ছিল না, রাত্রিতে একবারও ধূমপান করি নাই, সত্যই এই অপরিচিত বৃদ্ধা ও বালিকার সাম্‌নে বিড়ি ধরাইতে আমার কেমন লজ্জা করিতেছিল, সে বয়সে এমনি ব্যাকুব গোছের লোকই আমি ছিলাম। সকালে নেহাৎ কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল, বলিলাম, "দেশালাইটা একটু দাও ত?"

মাধবী দেশালাই দিয়া বলিল, "আপনি বিড়ি সিগারেট্ খান্, কাল ত খান নাই।"

আমি বিড়িটা ধরাইয়া পাইখানায় গেলাম। স্নান করিলাম না। আসিয়া দেখি, মাধবী বিছানাটা তুলিয়া, ঘরটা ঝাট্ দিয়া সব গোছাইয়া সেই ঘরেরই পাশের ছোট রোয়াকটার উপর ছোট একটী লোহার উনুনে কয়লা ধরাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া, ছাতাটা যেই ধরিয়া বাহির হইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে মাধবী ঠাকুরমার কাছে গিয়া স্পষ্টই বলিল "কাল ত বাবুর খুব কষ্টেই গেছে, আজ সকালেই দুটী ভাতে ভাত করে দিবো ভাবছি, আমি উনুনে কয়লা দিয়েছি। কি বলো ঠাকুরমা?"

ঠাকুরমার কথার উত্তর দেবার আগেই আমি বলিলাম, "না না, সে কি? তা কি হয়?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "দোষ কি বাবা? কাল ত দুজনেই খাবার খেয়ে আছ, আজ সকালে দুটো আলু ভাতে ভাত দুজনেই খেয়ে নাও।"

"এ অনুরোধ আমায় করবেন না মা।"

আমার কথার ভঙ্গিমা দৃঢ়তা ব্যঞ্জক সুতরাং বিলক্ষণ কঠোর সুরেই বাহির হইল। বালিকার মুখখানা যে কি আঘাত পাইয়াই নেহাৎ ব্যথা পাইবার মত অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িল, যেন যে অবস্থায় লোকে বলে, "উঃ", মাধবীর মুখে সেই অবস্থা ফুটিয়া উঠিল। আমি বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া মাধবী বলিল, "আপনার র‍্যাপার খানা নিয়ে যান। আমরা গরীব, আমি দুটী ভাত আপনার পাতে দিতে পারলে খুব সুখী হতাম নিশ্চয়ই।"

আমি বড় যেন আঘাত পাইলাম। সত্য কথা বলিলাম, "আটটায় আমায় ছেলে পড়াতে যেতে হবে।"

"আটটায়? সবে এই ছ'টা বাজে, আমি সাড়ে সাতটার আগে আলুভাতে ভাত আপনাকে দেবই।"

মাধবী পাখা লইয়া, উনুনে জোরে হাওয়া দিতে লাগিল। আমি ছাতাটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় সমস্যায় ত কখনও পড়ি নাই। পিছন ফিরিয়া মাধবী চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "আপনি ভাবছেন, এত বড় গরীবদের ঘরে অতিথি হওয়াটা কেমন? তা বেশ, আপনার কাছে ত পয়সা আছে, ঐ দোকানটা থেকে দু'পয়সার কাঁচা মুগের ডাল, আর দু'পয়সার ঘি নিয়ে আসুন, আপনার পয়সায়ই আপনাকে রেঁধে খাওয়াব। আপনার ত তবে ভাবনার কথা আর রইল না।"

মাধবী কথাগুলি এমন সহজভাবে বলিয়া গেল যে, তাহাতে যেন সন্দেহ সমীহের লেশ মাত্রও নাই। আমি দোকানে গিয়া সত্যই ডাল

ঘি আনিলাম, পথে একটী লেবুওয়ালা বসেছিল, তাহার নিকট হইতে এক পয়সায় দুটী লেবুও আনিলাম। ফিরিয়া আসিলে মাধবী বলিল, “আর তিন পয়সার দই যদি আনতেন। আমরা মাছ ঘরে আনতে পারি না, এ হাড়িতে মার রান্না হয় কি না? মা যা।বাবুদের বাড়ীতে ভাত আনেন, তাই আমি খাই।”

আমি ফিরিয়া গিয়া পাঁচ পয়সা দিয়া আধপোয়া দই আনিলাম। সাড়ে সাতটার আগেই ডাল, ভাত আলুভাতে রান্না হইল, মাধবী বৃদ্ধাকে গরমজল করিয়া দিল, তিনি স্নান করিয়া আহ্নিকে বসিলেন। আমি ভাত খাইতে বসিলাম। মাধবী বেশ রাঁধিতে পারে। খাইতে বসিয়া একটু পরিচয় যাহা জানিলাম, মাবধীর এই ঠাকুরমা ছাড়া আর কেহ নাই। এ বাড়ীর বাবুরা তাহাদিগকে দয়া করিয়া এই ঘরটী তাহাদিগকে থাকিতে দিয়াছেন।

মাধবী পরিবেষণ করিতে গিয়া অর্দ্ধেকটা দই তাহাকে দিয়া বলিল, সবটা দিলে হয় ত আপনি রেগে যাবেন, এই দেখুন আমাদের জন্য অর্দ্ধেকটা রেখে দিয়েছি।” আমার তখন আর একটা কথা মনে আসিল, বৃদ্ধাও ত এই ভাত খাইবেন, তাহা হইলে এক পোয়া দই আনা উচিত ছিল। আধপোয়া দই তিন জনের কুলাইবে কেন? কথাটা মনে মনেই রাখিলাম।

খাওয়া দাওয়া করিয়া, সুস্থ কিন্তু ভাবনা ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আসিবার সময়ে র‍্যাপারখানা আনিতে, আমিও ভুলিয়া গেলাম, তাহারাও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

(৩)

পূর্ব্বের মতই আমার দিন চলিতে লাগিল। এটর্নি বাবুর বাড়ীতে টিউশনি করিতে আবার গেলাম, গৃহিণী আমাকে নীচের ঘরে দরওয়ানের কাছে শুইবার যায়গা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বড় ছেলেটী আমারই সম্মুখে বলিয়াছিলেন "আবার এই সব বাজে লোক জায়গা দিয়ে একটা কিছু গোল বাধাবে দেখ্‌ছি।" আমি গৃহিণীর দয়ায় ধন্যবাদ দিয়া, সেখানে আর থাকিলাম না।

দু'দিন বাদলা ভাব থাকিয়া একবারে ফরসা হইয়া গিয়াছে, মাসের শেষ, বুঝি ফাল্গুন পড়ে পড়ে। রাজসহরের শত কৃত্রিমতার কঠোরতা ঠেলিয়াও বসন্ত একটু সাড়া না দিয়া ছাড়িল না। এই দারুণ দুর্য্যোগের পর কলিকাতার অধিবাসীরা স্বচ্ছ সুন্দর অপরাহ্নে পার্কের সবুজ পত্রের মধ্যেই তাহা অল্পবিস্তর অনুভব করিয়া লইল। আমিও সে দিন চারটার আগে বাহির হইয়া, সেণ্ট্ জেমস্ পার্কের একটী আসনে বসিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ বসন্তের শোভা উপভোগ করিতেছি। সবে বাইশ বৎসর মাত্র বয়স আমার, ভোগের স্পৃহা কতই আমার। কত লালসা লইয়া দুই বেলা ছেলে পড়াইয়া রাত্রি জাগিয়া বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। এখনও বাঞ্ছিত ভোগের সন্ধান মিলে নাই।

মানুষেরা বোধ হয় সকলের অপেক্ষা কামনার বস্তু প্রীতি, সহানুভূতি। এক মা ছাড়া দুনিয়ায় আমি কোথাও সহানুভূতি পাই নাই, মা মরিয়া গিয়াছেন এই চারি বৎসর, তাহার আগেও তিনি তিন বৎসর যাবৎ কঠিন রোগ যন্ত্রনায় ছট্‌ফট করিয়া কাটাইয়াছেন, এক মাত্র ছেলে আমি,

আমাকেও দুটী প্রাণ-ভরা স্নেহের কথা বলিতে পারেন নাই। স্নেহের আস্বাদ আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। জগতে কাহারও প্রতি স্নেহ করিবার মত অবসর বাবার ছিলই না। বাবার দুরন্তপনায় কাকা বিরূপ, মামাদের কাছে টাকা চাহিয়া বাবা পান নাই, সেজন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে বড় ঝগড়া করিয়াছিলেন, মামারাও সেজন্য বিরূপ। বৃদ্ধা নিঃসন্তানা পিসিমা ছিলেন, তাহার কিছু টাকা সঞ্চিত ছিল। সুদে বাড়াইয়া দিবেন লোভ দিয়া বাবা তাহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, ফিরিয়া দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই পিসিমার কাছেও প্রাণ দেওয়া স্নেহের আশ্বাস পাই না। কাজেই দীর্ঘ চারি বৎসর অনাবৃষ্টি জন্য মরুভূমির মত হৃদয়টা যখন সারা বিশ্বে তাপ কুড়াইয়া ও ছড়াইয়া চলিতেছিল, তখন হৃদয়হীন এটর্নির গৃহিণী আমাকে একটু স্নেহের পরশ লাগাইয়া দিলেন। তার পর সেই রাত্রেই মাধবীর ঠাকুরমার কাছে আঘাতের বিনিময়ে বড় মিষ্ট মার্জ্জনার মধুরতা অনুভব করিলাম, পরে সেই অজানা অচেনা বালিকা আমার বড় মোলায়েম সেবা যত্ন দিয়া একবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। কথাগুলি খুব তাড়াতাড়ি ভুলিতে পারিলাম না। আরও বাড়াইয়া গোছাইয়া ভাবিতে লাগিলাম। র‍্যাপারখানা সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, সে জীর্ণ ছিন্ন র‍্যাপার খানিতে আমার প্রয়োজনই ছিল না, আমি পরদিন একখানা নূতন কিনিয়া লইয়াছি। কিন্তু সেখানি যে, অতি পুরাতন, অব্যবহার্য্য, তাহা দেখিয়া মাধবীর মত প্রখর বুদ্ধিশালিনী মেয়ে কি ভাবিতেছে। তাহা-দিগকে দরিদ্র দেখিয়া র‍্যাপারখানি আমি তাহাদিগকে দান করিয়া আসিয়াছি, আর এমন পুরাণ অব্যবহার্য্য র‍্যাপার যে, তাহা দেখিয়া মাধবী নিশ্চয়ই আমাকে অনেক অবজ্ঞা করিবে। ইচ্ছা, তাহাদিগকে আর একবার দেখিয়া আসি ; কিন্তু গেলে ত তাহারা র‍্যাপারখানি ফেরত

দিবে। ভাবিবে এ ছেঁড়া কাপড়খানা লইতে লোকটা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, আহা সে কত বড় লজ্জার কথা? মাধবী হয় ত বা নূতন রকম আর একটু যত্ন করিয়া বসিবে। তবে ইহাদের পরিচয়টা আমাকে একটু ভাল করিয়া নেওয়াই উচিত ছিল। রাস্তায় যাইতে বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হইলেও হইতে পারে।

ভাবিতেছি, আর ছেলেরা ঝুল খেলিতেছে তাই দেখিতেছি, এমন সময়ে দেখি মাধবীই আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াই আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবু! আপনি কেমন ধারা লোক, আপনার র‍্যাপারখানি ফেলে এসেছেন, মা আমায় কত বকেছেন আমি দিতে ভুলে গেছি বলে।"

আমি কিছু বিস্মিতই হইলাম, যেন কোনও দেবতার আবেশের মত এরা আমায় পাইয়া বসিয়াছে। আমি বলিলাম "আচ্ছা একদিন গিয়া নিয়া আসিব।" বালিকা স্পষ্ট স্বরেই বলিল, "একদিন কি, আজই চলুন। ও, আপনি আর একখানা নূতন কিনেছেন। আপনি না হয়, কিনতে পেরেছেন, কিন্তু আমাদের ঘরে ও ভাবে একখানা ফেলে রেখে আসলে আমাদের কেমন লাগে বলুন ত?"

"ওখান নেহাৎ পুরাণ, ছিঁড়ে গেছে।"

"তাই আমাদের গরীব দেখে দিয়ে এসেছেন?"

আমি অবাক হয়ে মাধবীর মুখের উপর তাকাইয়া রহিলাম। সে মুখে কোনওরূপ দ্বিধা সঙ্কোচের চিহ্নও নাই; তাহার চুলগুলিকে বেণী বটিয়া দিয়াছে, পিঠের উপর কালো সাপের মত দুলিতেছে, কপালে একটী খয়েরের টিপ, কাণে দুটী ছোট দুল, নাসিকায় কোনও অলঙ্কার নাই,—কিন্তু সে দিন একটী মুক্তার নোলক ছিল দেখিয়াছিলাম, ওষ্ঠের উপর তাহার দাগটী রহিয়াছে; পরণে একটা ছিটের বডিসের উপর মোটা

কালোপেড়ে সাড়ী আজ স্পষ্ট দিবালোকে মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া দেখিলাম, মাধবী দেহে একটু হৃষ্টপুষ্ট বটে, কিন্তু বয়স তাহার এগার ছাড়ায় নাই, মাধবী মেয়েটী অদ্বিতীয়া না হইলেও বড় সুন্দরী। মাধবী আবার বলিল, "চলুন, এই ত আমাদের বাড়ী, আপনি কি ভুলে গিয়েছেন? দাঁড়ান, আমি ওদের বলে আসি, আমি ঐ বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে এসেছি কিনা? রোজই আসি।"

মাধবীর সঙ্গে আবার চলিলাম! পথে যাইতে যাইতে একটা দোতালা বাড়ী দেখাইয়া বলিল, এইটে আমাদের বাড়ী ছিল, বিক্রী হয়ে গেছে।" এবার মাধবী তাহার ঠোঁট দুখানা একখানার উপর আর একখানা রাখিয়া কেমন একটা ভাব করিল। সে যাইতেছিল আগে আগে, তাহাদের বাড়ীর কাছে গিয়ে আমারদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনার ইচ্ছা যে, র‍্যাপারখানা আমাদের দেন, না?"

কি জ্বালা! কি বলিব? আমি বলিলাম, "অমন ছেঁড়া জিনিষ কাউকে দিতে লজ্জা করে না?"

"তা কি হবে? আপনার ত ওর বেশী আর ছিল না? আমরা র‍্যাপারখানা ফিরিয়ে দিলে আপনার মনে কষ্ট হবে না? তা দেখুন, নেহাৎ যদি ওখান আপনার দেওয়ারই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে মাকে বল্‌বেন না কিন্তু, বল্‌বেন, তুলে রেখে দাও, একদিন এসে নিয়ে যাব।

বালিকার এ কথার অর্থ অনেক পরে বুঝিয়াছি। বৃদ্ধা ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের গৃহিণী, তাঁহার ছেলেটী কদাচারী হইয়া যেমন অল্প বয়সে মারা গিয়াছে,—তেমনি বাড়ীঘর বিষয় সম্পদও সকলই নষ্ট করিয়া গিয়াছে। পুত্রবধূটী এই মাধবীর মা স্বামীর আগেই স্বর্গে গিয়াছিলেন। বৃদ্ধা পৌত্রীটীকে লইয়া, পরগৃহে পাচিকার কার্য্য করিয়া দিন চালাইতেছেন, তবু কাহারও দান বা অনুগ্রহ চান না! যে বাড়ীতে

তাহারা থাকে, সে বাড়ীর কর্ত্তা বৃদ্ধার স্বামীর পরিচিত, তিনি মাধবী ও তাহার ঠাকুরমাকে ভাত কাপড় দিয়া প্রতিপালন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরমা তাহাতে রাজি হন নাই। বিশেষ তাহারা খাদ্যাখাদ্য মানে না, তুলসি গঙ্গাজল মানে না, ঠাকুরদেবতার ধার ধারে না। ঠাকুরমা তাহাদের সঙ্গে এক ঘরে থাকিতে রাজিই নন। অগত্যা তাহাদের দেওয়া ঘরটাতে আছেন, নইলে উপায় কি? এ সব খবর কিছুদিন পরে মাধবীর কাছ থেকে আমি কুড়াইয়া গোছাইয়া লইয়াছিলাম।

মাধবীর সঙ্গে তাহাদের ঘরে ঢুকিলাম। মাধবীই ঠাকুরমাকে বলিল, "ঐ ত উনি এসেছেন, ওঁর র‍্যাপার নিতে, সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন। ওনি বলেন, কাপড়খানায় দুটো যায়গা ছিঁড়েগেছে, আমায় রিপু করে দিতে, তা দিয়ে দেব, কেমন মা?"

সে দিন কিন্তু কথাবার্ত্তা বলিয়া, চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মাধবী আমার কাণের কাছে আসিয়া ছোট করিয়া বলিল, "আপনার নাম বিজয়? না? আপনার কাপড়ে লেখা আছে দেখেছি। কে লিখেছে? আপনি?"

আমি তার সকল প্রশ্নগুলিতেই সম্মতি দিয়া বলিলাম "তুমি লেখাপড়া করে থাক?"

মাধবী বলিল, "আমি উপরের ছেলেদের সাথে ব'সে পড়ি, সাহিত্য পাঠ আর বাংলার ইতিহাস পড়ি, সে দিন স্কুলে সাহেব এসে দুইখানা বই আমায় প্রাইজ দিয়েছিলেন। কাল আস্‌বেন, আমি দেখাব।"

ইহাদের সঙ্গে এই উপলক্ষে একটু ঘনিষ্ঠতাই হইল। এদিকে আমার দিনগুলিও এখন বেশ সহজে মোলায়েম ভাবেই কাটিতেছিল। এটর্নির বাড়ীতে সেই হইতেই একটু আদর যত্নই পাইতেছি,

সন্ধ্যাবেলায় গেলেই এক পেয়ালা চা, দুখানা বিস্কুট কোন দিন কচুরী মিহিদানা জলখাবার আসে। একদিন ঝিকে বলিলাম, এ সব কেন? ঝিটা আমার কাণের কাছে মুখ নিয়া বলিল, এ তোমার সে দিনকার কড়া কথায় লাভ। জান ত না বাবু,—বাবু, আর যেখানে যাই হোক, গিন্নীর কাছে একবারে বেরাল ছানাটী। ছেলে ব'লেছে মার কাছে, এমন ভাল মাষ্টার গেলে আমি আর কারু কাছে পড়্‌বো না। গিন্নীও বাবুকে এসে বলেছেন, গরীব ব'লে ভদ্র লোকের সুখ দুঃখ বুঝবে না। তুমি মাষ্টার ছোক্‌রাকে অমন ক'রে বলোনা কিন্তু। বুঝ্‌লে, শক্তর ভক্ত।" ছাত্র পড়িতে আসিল ঝি আর বলিতে পারিল না।

আমি কিন্তু ভাবিলাম, কে বলে সংসারে সহানুভূতি নাই? এই ত বিশ্ব সদয় হইয়া আমার প্রতি সহানুভূতি ঢালিয়া দিতেছে, নিতান্ত হীনবৃত্তি এই দাসীটাও ত আমার উপর কত সহানুভূতি দেখাইল, এটর্নি-গিন্নীতাসত্যই আমায় স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর মাধবীর ঠাকুরমা আমাকে সত্যিকার ভালবাসা দিয়াই আদর করেন। সে দিন বাবুদের বাড়ীর সত্যনারায়ণের প্রসাদী সন্দেশটুকু পর্য্যন্ত আমার জন্য তুলে রেখেছিলেন।

আমি কিন্তু এই কয়দিনে, আমার সমস্ত পরিচয়টা তাহাদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি। দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না, তবু দুষ্ট মাধবী মেয়েটা কেমন করিয়া কথার ছলে আমার সমস্ত পরিচয় বাহির করিয়া লইয়াছে। আমি এখন যখন যাই, মাধবীকে একটু একটু পড়াই, মাধবী বলে সে ইংরাজী শিখ্‌বে। আমিও তাহাকে ইংরাজী পড়াই।

মাস দুই পরে সংসার আবার তিক্ত হইয়া উঠিল। রেলের সাহেবটা আমাকে চাকরী দিবে বলিয়া কথা দিয়াছিল, সময় উপস্থিত হইলে বলিল, না এবার হবে না পরে খালি হইলে দেখা যাবে। আসল

কথা শুনিলাম, আর একটা লোকের কাছ থেকে আড়াই শত টাকা প্রণামী লইয়া চাকরীটা তাহাকে দিয়াছে। মনটার ভিতর যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। ভাবিলাম সহরে চাকরী করা আর চলে না। যাই পল্লী-গ্রামে গিয়া দেখি একটা স্কুলের মাষ্টারী পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সে চেষ্টা ত একবার করিয়া দেখিয়াছি, সেখানে পঞ্চাশ টাকা লিখিয়া পঁচিশ টাকা দশ কিস্তিতে তিন মাস অন্তর পাইতে হয়, আবার মেম্বর মহাশয়দিগের ছেলেদের স্কুলের বেতন না পাইয়া বরাত কাটিতে হয়, প্রয়োজন হইলে সম্পাদক মহাশয় যাহাকে একঘরে করিতে চাহিবেন, তাহার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দিয়া কর্ত্তার মনের মধ্যে থাকিতে হয়।

মাধবীদের বাড়ীতেও আজ কয়দিন যাই না, সময় হয় না, কয়দিন ধরিয়া সাহেবের আফিসেই ঘুরিতেছি। এটর্নি সাহেব গ্রীষ্মের অবকাশে আরাম করিতে সপরিপারে পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন, গৃহিণী আমাকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ছেলের পড়ার বাধা পড়িবে ভাবিয়া। আমি এই চাকরীর আশায় যাই নাই। পাজী ফিরিঙ্গি আমার কি সর্ব্বনাশই করিল, এ দুটো মাস আমার বাসা খরচই যে চলিবে না।

পরদিন দুপুরেই মাধবীদের বাড়ীতে গেলাম। ঠাকুরমা দেখিয়া বলিলেন, "আহা বিজয়! আজ কত দিন এসো না কেন? আমি যে বাবুর রাঁধি, তার কাঠের গোলায় একজন লোক নেবেন, তোমার কথা আমি বলেছি, তিনি তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছেন। চল এই বিকালেই আমার সঙ্গে, লোকটা আমায় বেশ মান্ত করে।"

মাধবী বলিল, "এই চাকরী আপনার হবেই। হলে কিন্তু সত্যি-নারায়ণ পূজো দিতে হবে, দেবেন ত?"

আমি চাকুরীর চেষ্টায় ও অভাবে খুব মুস্কিলেই আছি, তাহা এই নেহাৎ পর দুটী জীব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াই, এতটা মন দিয়া ভাবিয়াছে, এই ভাবনাটা মনে জাগিয়া মনটাকে বেশ একটু বিষাইয়া দিয়াই গেল। মাধবীর কথায় কোন উত্তরই দিলাম না, মাধবী আবার বলিল, "আপনি দেবতা মানেন না বুঝি? পূজো মানেন না?"

"মানি বই কি?"

মাধবী আবার বলিল, "চাকরী আপনার হবেই। আমি সেদিন তুলসীর পাতায় লিখে পরীক্ষা করে দেখেছি। একটা লিখ্লাম, হ্যাঁ, আর একটায় না, ছোট্ট খুকীকে বল্লাম, নেত একটা পাতা; খুকিটা হাঁ-টাই তুলে নিলে।" আমি হাসিলাম মাত্র, যা হোক পড়ে পাওয়া স্বজন এই মেয়েটা তবু আমার জন্য এতটা ভাবে।

ঠাকুরমার সঙ্গে বাবুর বাড়ীতে গেলাম। বাবু একটা সাহেব কোম্পানির কাছে আমায় একটা চিঠি লিখিতে বলিলেন। তাহাতেই আমার পরীক্ষায় পাশ হইল। মাসে ৪০৲ টাকা বেতনে বাবু আমায় নিয়োগ করিলেন, অধিকন্তু কারখানায়ই খাওয়া মিলিবে। আসল কথা ঠাকুরমার সুপারিশের খুবই জোর ছিল, তারপর বাবুরও বড় প্রয়োজন। তাঁহাদের ছেলে পুলে নাই, টাকা অনেক, গৃহিণী ধরিয়াছেন কাশীবাসিনী হইবেন। বাবুও অবশেষে তেমনি মত করিয়াছেন। একজন লোকের উপর কারবারের ভারটা দিয়া যাইতে পারিলেই নিষ্কৃতি। বাবুর আর একটা বিশ্বাস, পুরাতন লোক চোর হয়, নূতন লোক শীঘ্র চুরি করিতে বোঝে না। তাই আমাকেই নিয়োগ করিলেন। আমি দেখিলাম মাধবীর সত্যনারায়ণ নেহাৎ একেবারে মিথ্যা নয়।

চাকরী হইল বটে, আমার বাবু সস্ত্রীক কাশীধাম যাইবেন, কিন্তু ঠাকুরমার যে চাকরী উঠিয়া গেল। তখন ইহাদের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্টতা হইয়াছে, ঠাকুরমাকে স্পষ্টতই বলিলাম, "ঠাকুরমা! আপনাদের দুটীর খেতে আর কতই বা লাগ্‌বে, বড় বেশী লাগেত ১২৲ টাকা, একভাবে চলেই যাবে। আপনি আর এ বয়সে পরের বাড়ী রাধ্‌তে যাবেন না?"

শুনিয়া বৃদ্ধা যেন অগ্নি অবতার হইয়া উঠিলেন। "যতদিন গতর আছে, খেটেই খাবো, পরের কাছে ভিক্ষে মাগবো? সেদিন তোমার খাবারটা মাধবীকে খেতে দিয়েছিলাম বলে বুঝি, তোমার এত স্পর্দ্ধা? তুমি ছেলে মানুষ একটা সৎকাজ কর্ত্তে যাচ্ছ, তাই বাধা দেই নাই, ওকথা কিন্তু আর কখনও বলো না।"

বৃদ্ধা সে রাগের মাথায়ই একটা পুরান বাক্স খুলিয়া একখানা ডাক ঘরের পাশ বই বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। বলিলেন, "দেখ্‌ত কত আছে?" মাধবীকে বলিস্‌নি কিন্তু খুলিয়া দেখিলাম দু'হাজার একশ বায়ান্ন টাকারও কিছু উপরে। ইহাদিগকে আমি গরীব বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলাম। মনে বড় অনুতাপ আসিল বৃদ্ধা বলিলেন, "করি কি? মেয়েটা যদি বাঁচে, আজ কালত শালারা টাকা নইলে মেয়ে নিতে চায় না। একি আজকার টাকা? আমার শশুর আমায় দিয়েছিলেন। মিন্‌সে কতবার নিতে চেয়েছিল, পারে নি। ছেলে জান্‌তই না, তবে তার ব্যারামের সময় শ পাঁচেক তুলে ডাক্তার খরচ করেছিলাম, সে রোগ কি টাকায় সারে?"

মাধবী বলিল, এতদিন আমায়ও বলনি মা?"

"তা নাই বা বলেছি, এখন এই বই নাও তুলে রাখো। তোমার বর আস্‌বার আগেই যদি আমি মরি, তখন এদিয়ে একটা বর কিনে নিও।"

মাধবীটা হাসিয়াই বলিল, "তোমার শ্রাদ্ধে যে অনেক টাকা লেগে যাবে।"

আমার ইচ্ছা করিতেছিল বলিয়া ফেলি, মাধবীর বিবাহটা এখনই দিয়া যান না কেন? কিন্তু কি যেন ভাবিয়া কথাটা আমার বলা হইল না। তবে শেষ কালে খুব শক্তভাবেই বলিলাম, "ঠাকুরমা তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর কারু বাড়ী রাধ্‌তে যেতে পার্‌বে না, যদি যাও, আমার মরামুখ দেখ। ও টাকার দুই চার পাঁচশ কমে গেলেও মাধবীর বিয়ে আট্‌কাবে না বল্‌ছি।"

মাধবীও বলিল, "অর্থাৎ যা আট্‌কায় আপনি আছেন।" বলিয়াই দুষ্ট মেয়েটা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল! আমি ভাবিলাম, মেয়েটা নেহাৎ বেহায়া বক'টে হ'য়ে গেছে।

(৪)

ভাল চাকরীই আমার হইল, আমি হইলাম এখন গোলার কর্ত্তা। ১০।১২ দিন মধ্যে কাজ কর্ম্ম বেশ বুঝিয়াই লইলাম। আমার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া কর্ত্তা খুব খুসিই হইলেন, তিনি গঙ্গাস্নান আর গীতাপাঠেই বিভোর হইয়া থাকেন, কাজ আমিই দেখি। আগামী বৈশাখে হাল খাতার পরেই কর্ত্তা সস্ত্রীক তীর্থ যাত্রা করিবেন স্থির হইয়াছে।

এখন মাধবীদের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতে পারি না, সময় পাই না। সকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত গোলার কাজ, তারপর রাত্রিতে গৃহের

বাহির হইলে গোলায় লোকজন ভাল মনে করিবে না, পুরান দুইজন সরকার আছেন তাঁহারা আবার পদের বিদ্বেষ করেন। তবে রবিবার দুপুর বেলাটায় একবার যেরূপে হোক, সময় করিয়া মাধবীকে দেখিয়া আসি। রবিবার না হইলে এ সময়ে মাধবীর সঙ্গে দেখা হয় না, অন্য দিনে সে স্কুলে যায়।

এই কারবারের মধ্যে ঢুকিয়া আমার মনে আর একটা ভাব জাগিয়াছে। এমন ৪০।৫০ টাকা মাইনের পরের তাবেদারী করিলে ভবিষ্যতে কিবা উন্নতি হইতে পারে? স্বাধীনভাবে একটা কোনও ব্যবসার আমায় খুলিতেই হইবে, টাকার অভাব ত হইবে না। মাধবীর ঠাকুরমার পাশ বহিতে দু'হাজার টাকা, বুড়ী 'বলে হাজার খানেক টাকা দিয়া মাধবীর গয়না গড়াইবে। অলঙ্কার গড়াইয়া টাকা নষ্ট করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। মাধবীর বিয়ে হইবে মাত্র শাঁখা সাড়ি দিয়ে বাজে খরচ আবার কি? একদিন দেখিলাম, মাধবী গলায় একগাছা কড়িহার পরিয়াছে। বড় সুন্দর মানাইয়াছে, হার গাছটা মাধবীর গলে, সে দিন আমাকে বুঝিতেই হইল, অলঙ্কারেরও প্রয়োজনীয়তা আছে; নইলে জুয়েলার সপ্‌গুলি এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে কিরূপে? একটা জুয়েলারের দোকান খুলিতে পারিলে সবার চেয়ে ভাল হয়। বড় ভদ্র ব্যবসায়, অল্প যায়গা লাগে, কাঠ ঠেলাঠেলি লোহা লক্কড় ঘাটাঘাটি কিছুই করিতে হয় না। বাইস তেইস বছরের মন, পলকে হাজার কল্পনা জাগে। কল্পনাকে চাপা দিয়া বলিলাম, "মাধবী ত সুন্দর হারগাছটী গলায় পরেছ দেখ্‌ছি, ঠাকুরমা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে আরম্ভ কল্লেন বুঝি।"

মাধবী বলিল, "হ্যাঁ, সেই টাকা? সে টাকা বুড়ীর বুকের হাড়। এ হার ত আমার মায়ের ছিল।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ঐ হারগাছটা আমি অনেক কষ্টে রেখে দিয়েছিলুম। সকলে পরে তাই আজ বার করে দিয়েছি, ওর পর্‌তে সাধ আহ্লাদ হয় বইকি ?"

"এ রকম এক গাছা হার গড়্‌তে কত লাগে ঠাকুরমা ?"

"আজকাল সোণার দাম কমেছে, শ'তিনেক টাকা হ'লে বোধ হয়, হয়।"

"আচ্ছা এ গাছা বিক্রয় কর্লে এখন কত হ'তে পারে ?"

"তা আর কত ? এই বড় জোর দেড়'শ টাকা।"

"আর দেড় শ টাকা তবে শ্যাক্‌রার লাভ ? মানুষগুলি কি বোকা ?"

মাধবী বলিল, "ঠিক কথা। আমি কিন্তু ভাবি, এই সহরের বড় লোকগুলি যদি এমন নক্‌সাকাটা বড় বড় বাড়ী আট্‌কে না রেখে, আর দশজনকে থাক্‌তে দিত, তা হলে এতগুনো বাড়ী না হয়ে আরও অনেক যায়গা খালি থাক্‌তো, সহরের লোক একটু নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌ত ? কি বলেন মাষ্টার মশাই সত্যি না ?" মাধবীকে এখন একটু একটু পড়িয়ে দেই, তাই সে আমায় মাষ্টার মশাই বলে ডাকে। সে দিন উপরের বাবুদের মাষ্টার মহাশয়ের কাছে সে পড়া জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল, মাষ্টার মহাশয় সময় নাই বলিয়া ধমকদিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে মাধবী বুঝিয়াছিল, ছেলেবেলায় একজন মাষ্টার মহাশয় না থাকা বড় দুরদৃষ্টের কথা, আমাকে মাষ্টার ডাকিয়া সে দুঃখ তাহার গিয়াছে। মাধবীর আগেকার ঐ কথাটা শুনিয়া আমি বলিলাম, "মেয়েটা একবারে ইচড়ে পেকে উঠেছে !"

মাধবী তাহাতে একটুও অপ্রতিভ হইল না, তাহার কালো রেখাটার মতন ভ্রু দুটী টানিয়া, কালো দুটী চক্ষের তারা একটু আড়ভাবে

ভাবাইয়া তুলিয়া বলিল, "আমি যে বার বছরে পড়েছি, এখন কি আমি ছোট খুকীটী আছি ?"

না হাসিয়া পারিলাম না। বলিলাম, "তবেত তোমার বিয়ের ...র এসে পড়েছে।"

"তা বই কি ? মা ত কেবল সেই কথাই ভাবে। বুড়ীটা এমনই পাগল ! বিয়ে হলে ত আমায় বরে নিয়ে যাবে, তখন মা একলাটী পড়ে কাঁদ্‌বে না ? আপনার দুঃখ আপনি টেনে আনে।"

"যাঃ—এমন পাগলা মেয়ের আবার বিয়ে ?"

"আমিও ত তাই বলি, মা বলে হাজার টাকা বরকে দিয়ে ভুলিয়ে ...ন্‌বে, বুড়ীটার এমনও বুদ্ধি।"

ঠাকুরমা সে দিন বলিলেন, "দেখ বিজয়, এই মাধবীর ভারটা নামাতে ...লেত আমি কাশী চলে যেতুম, এই ত ও বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী চ'লে ...চ্ছেন ; এত ঐশ্বর্য্য, সব ছেড়ে কেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমার এ কি ...য়া বলদিনি ?"

ঠাকুরমাকে বলিলাম, "ব্যস্ত কি ঠাকুরমা ? বিয়ে দিলেইত এখনই ...ধবী গিয়ে ঘর কর্ত্তে পেরে উঠ্‌বে না, আপনাকে আরও দুটো বছর ত ...কে আগ্‌লে রাখ্‌তেই হবে।"

"শাশুড়ী ননদ থাকা ঘরে দিতে পার্‌লে হতো ভাল বটে, তা এমন ...ও না থাকা মেয়েত কেউ ছেলের বউ কর্ত্তে চায় না। যার যেমন ...তি, তেমনি এনে মিলায় বিধি আর কি ?"

১২০৯ সালের সেই নিমতলার কাল অগ্নিকাণ্ডের কথা বোধ হয় ...লের মনে আছে। একদিনেই এত বড় দড়মাহাটা বাজারটা ছাই ...য়া গেল। আমি জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া মুনিবের কাগজ পত্র টাকা ...ড় যা কিছু বাঁচাইতে পারিলাম বটে, কিন্তু সম্মুখের উপর লক্ষ লক্ষ

টাকা ভস্ম হইতে দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। আমার একটা পাশ আগুনে ঝলসিয়া গিয়াছিল, সকলেই বলিল, আর একটু হইলেই আমার বাঁচিবার আশা ছিল না, অমন জলন্ত সিড়ির উপর দিয়া দুই দুইবার ওঠা নামা কি দুঃসাহসেরই কাজ!

গোলার মালিক আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "বেশ হ'য়েছে! আমার পক্ষে এটা ভগবান অগ্নি দেবের পরম দয়া বল্‌তে হবে।" দমকল ওয়ালারা তখনও আগুন নিবাইতেছিল, কিন্তু আমাদের কর্ত্তা সেদিকে কিছুমাত্র মন না দিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীতায় বিশ্বরূপ স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া লোকে ত অবাক!

পরদিনই তিনি সপরিবারে কাশী না বৃন্দাবন কোথায় যাত্রা করিলেন। কিছু বলিয়াও গেলেন না। আমি ত ভাবিলাম, একি বিপদ! যা'হোক, গোলায়ত দু-তিন হাজার টাকা নগদ তহবিল ছিল, সেটা নিয়ে যেতেও তিনি পার্ত্তেন।

গোলার যাহারা মহাজন ছিল, তাহারা আসিয়া আমায় ধরিল। আমি বলিলাম, গোলার বিলাতবাকি বিস্তর আছে, ব্যবসায় চালাইতে পারিলে খদ্দেরের কাছে টাকা আদায় হইতে পারে বটে, মহাজনের ঘরও শোধ হইলে হইতে পারে। কিন্তু মালেক ছাড়িয়া গেলেন, এখন আর কি করা যাইবে।

মাড়ওয়ারি মহাজন, সহজে টাকা ডুবিতে দেয় না। তাহারা বলিল, তুমি গোলা চালাও, আমরা মাল সরবরাহ করিব। শতকরা কুড়ি টাকা বাটা ছাড়িয়া আমরা বাকি টাকা লইতে রাজি আছি। এ ব্যবস্থা আমারই মনঃপূত। তাহাই করিলাম। বি, কে, সিংহ নাম দিয়া গোলার নূতন নামকরণ করিয়া, সেই ভস্মস্তূপ ঝাড়িয়া নূতন জীবনে নূতন স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম।

ছুনিয়ার সকল কাজ ত্যাগ করিয়া, ব্যবসায় মন দিলাম। মাধবীদের ওখানে ছ'মাসের মধ্যে ছু'দিন মাত্র যাইতে পারিয়াছি, তাও ছু'দণ্ড বসিতে পারি নাই। তবে তাহাদের অবলম্বনেই আজ এই এত বড় একটা কাঠের গোলার আমি মালিক, তাহা ভুলিয়া যাই নাই। ঠাকুরমাকে স্পষ্টই বলিয়া আসিয়াছি, আমার সময় নাই যে আসা যাওয়া করি, তবে এটা জান্‌বেন, আপনার কৃপায় আমার এই উন্নতি, তা আমি ভুলে যাই নাই।

ঠাকুরমা এখন আর আমার দেওয়া খরচের টাকা লইতে অস্বীকার করেন না। কয়বার নিজে যাইতে না পারিয়া দরোয়ান দিয়া টাকা পাঠাইয়াছি। প্রত্যহ ব্যবসায়ে পঞ্চাশ ষাট টাকা লাভ হাতে আসিতে লাগিল। ঝড়ের মত হু হু করিয়া শত রকমের আশা আসিয়া মনের মধ্যে বাসা করিতে লাগিল। ভবানীপুরের দিকে পাঁচ কাঠা জমি ইহারই মধ্যে কিনিয়া বসিলাম!

ব্যবসায়ে ঢুকিয়া দেখিলাম, মাড়োয়ারি মহাজনেরা অনেকই লাভ করে। সরাসরি রেঙ্গুন হইতে মাল আনার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে লাভ অনেক বেশীই হইতে পারে। সঙ্কল্প করিলাম রেঙ্গুন একবার গিয়া দেখিয়া আসিতেই হইবে। সঙ্কল্প মাত্রই আমার প্রতিজ্ঞা। দিনও স্থির করিলাম।

হঠাৎ দরোয়ান আসিয়া টাকা দশটী ফেরত দিয়া একখানা চিঠি হাতে দিল। মাধবী টাকা ফিরাইয়া দিয়াছে, আরও লিখিয়াছে, "আপনি ওরূপ ভাবে আর টাকা পাঠাইবেন না। আপনার টাকা আমাদের নেওয়া আর উচিত নয়। টাকার লোক হইয়াছেন বলিয়া, টাকা নাই যাহাদের, তাহাদের ওরূপ অবজ্ঞা করিতে নাই। ঠাকুরমার বড়ই শরীর খারাপ।"

পত্রখানা পড়িয়া বড় লজ্জা বোধ হইল। তাইত, আজ আট দশ মাসের মধ্যে একবার দেখিয়া আসিতেও সময় পাই না। মাধবী বড় রাগ করিয়াছে, যাহাই হউক মাধবীকে সংসার সঙ্গিনী করিতে পারিলেই আমার আশা পূর্ণ হয়। রেঙ্গুন হইতে আসিয়াই পিসিমাকে এখানে আনিয়া শুভকাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। কথাটা এবার মাধবীদিগকে স্পষ্টই বলিয়া আসিব।

ঠিক দু'পুর বেলায়ই আহারাদির পর একটু বিশ্রাম না করিয়াই একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া মাধবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দ্বারে ঘা দিতেই মাধবী দ্বার খুলিয়া পার্শ্বে সরিয়া মাথাটা নোয়াইয়া দাঁড়াইল। আমি বিস্মিত হইলাম, একি? আমাকে দেখিলে মাধবীর মুখখানা যে হাসিতে একবারে ভাসিয়া উঠে, চকের তারা দুটী যেন আনন্দে নাচিতে থাকে। আজ এ কি নূতন দেখিলাম! মাঝে যে গোটা একটা বছর কাটিয়া গিয়াছে, তাহাত গণিয়া দেখিতেছি না। বলিলাম, "কেমন আছ মাধবী।" "ভাল আছি, ঠাকুরমাকে উপর থেকে ডেকে নিয়ে আসি," ছোট করিয়া এই ছোট কথাটী বলিয়া মাধবী পিছনের দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল। কত আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া, পিঠের আঁচলটা কত সাবধানে টানিয়া গোছাইয়া সেই উচ্ছৃঙ্খল অবাধমুখী পাগলী মেয়ে মাধবী কত শিষ্টের মত বাহির হইয়া গেল! আজ দেখিলাম, আহা যৌবন বসন্তের সরস পরশে মাধবীর দেহলতিকায় কিবা সুষমার ভাতি ফুটিয়া উঠিয়াছে! দ্বার খুলিয়া যাইতে, সে একবার ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া, চাহিয়া গিয়াছিল, আমি বসিলাম কি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাই বুঝি দেখিয়া গেল। বসিয়া পড়িয়াছিলাম, দেখিলাম তাহার ওষ্ঠের উপর নাসিকার কোণে মুক্তাবিন্দুর মত ঘর্ম্ম ফুটিয়াছে, ফিরিয়া চাওয়াটা যেন বড় দোষের ভাবিয়া সে লজ্জায় সে কটাক্ষটী মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া

কত সাবধানেই লুকাইয়া লইল। যতক্ষণ একাকী বসিলাম, ততক্ষণ ভাবিলাম, আরে মাধবী! আর কতদিন সে বাল্য বয়সের দর্প করা তোমার চলে?

ঠাকুরমার সঙ্গে মাধবীও ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, বৃদ্ধার শরীর বড় কৃশ হইয়াছে। বলিলাম, "ঠাকুরমার কি কোনও অসুখ করেছে?" ঠাকুরমা বলিলেন, "সত্তোর বছরের বুড়ীর আবার অসুখ কিরে ভাই, যমের তাড়না, আর কি?"

"যাই বলো ঠাকুরমা, মরবার সময় তোমার এখনও হয় নাই। মাধবী তার বরের সঙ্গে ঝগড়া করে, ঘরের কোণে পড়ে থাকবে, খোকা-খুকী তার কেঁদে গড়াবে, তুমি না হলে কে তার সংসার আগলাবে ঠাকুরমা।"

আমার এমন কাঁচা কথায়ও ঠাকুরমা যেন বড় খুসী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "হাঁ, বিজয়, তুমি নাকি যায়গা রেখেছ, বাড়ী করবে।"

"যায়গা রেখেছি ঠাকুরমা, ভবানীপুরে গঙ্গার ধারেই, ছোট একখানি বাড়ী করবো ভাব্‌ছি, তা কারবারটা আর একটু দোরস্ত না করে পাচ্ছি না"

ঠাকুরমা আমার কাছে ঘেসিয়া বসিলেন, তারপর বেশ একটু গম্ভীর হইয়াই।বলিলেন, "দেখ বিজয়, আর ত দেরী করা চলে না। তোমার মাধবীকে তুমি নাও, আমি স্বচ্ছন্দে যাত্রা করি; আমার কিন্তু আর বেশী সময় নাই।"

আমিও বলিলাম, "আর দুটী মাস অপেক্ষা কর্ত্তে হবে, সামনে ত চৈত্র মাস, বৈশাখ মাসটা আস্‌তে দাও। আমি কিছুদিনের জন্য রেঙ্গুনে যাচ্ছি। মাড়োয়ারি মহাজনের সঙ্গে কারবার করে ততটা লাভ হয় না, রেঙ্গুনে গিয়ে একটা সাহেব কোম্পানির কাছে বন্দোবস্ত করে মাল আন্‌বার চেষ্টা করবো। আপনার আশীর্ব্বাদেই আমার সব, আশীর্ব্বাদ

করুন, এ যদি পারি তবে কারবারে আমার বছরে পঞ্চাশ হাজার লাভ হবে।”

মাধবী লজ্জানতমুখী হইয়া পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভাব সে বেশীক্ষণ রক্ষা করিতে পারিল না, এখনও পাকাপাকি অভ্যাস হয় নাই। সে সহজ দৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিল “একবারে পঞ্চাশ হাজার? এত টাকায় কি হ’বে।

আমি খুবই হাসিলাম, বলিলাম, “ঝাপি কিনে টাকাকড়ি রাখ্‌বো, তার পর সেই টাকা দিয়ে দাসী নফর রাখ্‌বো, আর কি?

মাধবী সে ব্যঙ্গ যেন কিছু মাত্রও অনুভব না করিয়া বলিল, “অত টাকার নেশা ভাল না।”

মাধবীর কথায় উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। ঠাকুর-মাকে বলিলাম, “দেখ, ঠাকুরমা, টাকা না হ’লে আজকাল সুখ স্বস্তি মান মর্য্যাদা মোটেই হয় না। টাকার অভাবে কত কষ্ট পেয়েছি জান ত, টাকা আমাকে কর্ত্তেই হবে। আমি ত ভাবছি, বাড়ীটা করে নি, তার পর পিসিমাকে নিয়ে আসি। দেশ থেকে দুপাঁচজন, আত্মীয় স্বজন,—আর ত বেশী কেহ নাই,—মামা মামীরা আছেন, কাকা-মহাশয়ের মেয়েরা আছেন, তারা ত জাত-ছাড়া ব্রাহ্ম, তাদের ত আনা হবে না, যা’হোক দশজনে মিলে মিশে কাজটা হলে, তোমার দেখে একটু শান্তি হোক।”

ঠাকুরমা একটু ভাবিলেন, তাহার মুখখানা যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বিশ্রী হইয়া উঠিল। তিনি বড় বিষাদেই বলিলেন, “এ কাজ হবে না বিজয়; তুমি আর আমায় লুব্ধ আশ্বাসে ভুলিও না। যার কারবারে লাভ পঞ্চাশ হাজার, কলিকাতা সহরে বাড়ী, একটা পথে পড়া বুড়ীর নাতিনী সে ঘরে যেতে পারে না। যা’ক আমি অন্য চেষ্টা দেখ্‌বো।”

আমি এবার সুর করিয়াই হাসিলাম। "ঠাকুরমার মনে কত বড় অবিশ্বাস দেখ। তবে দাওনা তুমি আমাদের হাতে হাত জুড়ে, এ কাজে পুরোত সামাজিকের আবশ্যক হবে না, তোমারই আশীর্ব্বাদে এতে মঙ্গল ঝরে পড়্‌বে। যদি রেঙ্গুনে যাবার সময় ঠিক করে না বস্‌তাম, তা হলে এই ফাল্গুনেই যা হয় একটা হয়ে যেত।"

ঠাকুরমা একটু প্রফুল্ল হইলেন। মাধবী আবার লজ্জাসঙ্কুচিত বধূটীর মত, আঁচল টানিয়া বামচক্ষুর অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া, আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল। ঠাকুরমা একটু বসিয়া থাকিয়া, বলিলেন, "শুয়ে থাক একটু এখানে, এত দুপুরে বেরিও না কিন্তু। আমি উপরে যাচ্ছি, গিন্নীর নাতির অন্ন-প্রাশন, আমাকে ডেকেছিলেন জিনিষ পত্রের একটা ফর্দ্দ কর্ত্তে।"

আমার বিলম্ব করার ইচ্ছা ছিল না, তবু একটু গড়াইয়া এত বড় প্রখর মধ্যাহ্নটাকে একটু গড়াইয়া দিবার চেষ্টাই করিতে লাগিলাম। বুঝি ঘণ্টা খানেক সময় কাটিয়া গেল, বড় লম্বা বোধ হইতেছিল, আজ দু'টী বৎসরের মধ্যে এত সময় বৃথা কাটাইয়াছি বলিয়া ত বোধ হয় না। ইহারা কেহ না আসিলেই বা যাই কি করিয়া? মাধবীকে আর একটু দেখিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে। সত্য কথাই বলিব, আজ যেন সেই প্রেমের বিধাতা অনঙ্গঠাকুরটী আমার চব্বিশ বছরের দেহমনটাকে বেশ একটু নাড়া দিয়া গিয়াছেন। কিশোরীর অপাঙ্গদৃষ্টির সূত্র পাইলে এ দেবতাটীর শরসন্ধানে বিলম্বই হয় না। শুইয়া শুইয়া রাগই হইতেছিল, এতক্ষণের মধ্যে মাধবী কি একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারে না?

দ্বারে কপাট খোলার শব্দ হইল, কপাটধরা মাধবীর বালাপরা হাতখানি দেখিয়া বলিলাম, "বেশ, আমি যেন কয়েদী।"

মাধবী ঐখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "তাই অস্বস্তিতে ঘুম আস্‌ছে না।"

"ঘুম একটু যেন এসেছিল।"

"মিথ্যে কথা, একটুও না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি না?"

"দাঁড়িয়ে আছ? আর আমি এই গরমে ছট্‌ফট কচ্ছি?"

"তাও দেখ্‌ছি, কিন্তু আপনার দেহের শীত গ্রীষ্ম ভেবে দেখ্‌বার আমার কি অধিকার আছে?"

"বটে? আজ এমন স্বত্বের বিচার? সেই যে প্রথম দিন আমাকে অত ব্যস্ত হয়ে রেঁধে খাওয়াইবার কি অধিকার তোমার ছিল?"

"তখন আমার এগার বছর বয়স ছিল, এখন চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছি না?"

আমি হাসিলাম, হাসিটা শব্দে ছুটিয়াই বাহির হইল। মাধবী ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "ছি ছি, করেন কি,, এমন চেচিয়ে হাস্‌ছেন?

আমি উঠিয়া বসিলাম, মাধবী জল দিল, মুখ ধুইলাম, গামছা খুঁজিয়া সে পাইল না, বলিল, "আপনার পকেটে রুমাল আছে না? গামছাখানা ত পাচ্ছি না।"

আমি মাধবীর আঁচলটা টানিয়া মুখ মুছিলাম। মাধবী দাঁতে অধরে শক্ত করিয়া মিশাইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর বলিলাম, "এখন যাই, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।" মাধবী বলিল, "ঠাকুরমা খাবার আনিয়ে রেখেছেন, খাবেন না?"

সে একখানা থালায় কিছু মিষ্টান্ন সাজাইয়া আমার সম্মুখে ধরিল। আমি বলিলাম, "এ কি? এত খাবার এ সময়ে খেতে আছে? না, ও সব রাখ।"

"না খেলে বুড়ীটা দুঃখিত হবে না?"

"আচ্ছা, দাও, কিছু খাই, এ সকল বাজারের খাবার না খাওয়াই ভাল।"

"এ কথাটা দোকানদারের মুখে ভাল হয় না। খাবারের দোকানদারও খদ্দের চায়, কাঠের দোকানদারও খদ্দের চায়। তবে কেউ পঞ্চাশ হাজার, কেউ বা পাঁচ কুড়িতেই খুসী।" মাধবী আবার বালিকার মত হাসিয়া ফেলিল।

"আর তোদের কাছে সত্যিকথা বলা হবে না, শেষে অত ঠাট্টা তামসা শুন্‌তে যাব কেন?"

"সত্যি, আপনি টাকাই এত ভালবাসেন এ কথাটা না বলাই ভাল ছিল। রাস্তার কাউকে ভালবেসে এসে, ঘরে কি তা বল্‌তে আছে? কুরুক্ষেত্র বাধে না?"

"আরে, তুই কি তবে আমার ঘর?"

মাধবীর মুখখানা একবারে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে যেন মুখ-ানা কোনও উপায়ে ঢাকিতে না পারিয়া আমার পাশেই চৌকির পর উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখখানা ষোল আনাই ঢাকিয়া ফেলিল। াহার আলু থালু চিকণ কালো চুলগুলি অসংখ্য সর্পশিশুর মতন ড়াইয়া পড়িয়া তাহার সমস্ত পৃষ্ঠ স্কন্ধ বাহুরও অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া ফেলিয়া-েল, সেই কৃষ্ণকেশের অন্তরাল হইতে ক্ষুদ্র কর্ণভূষার শ্বেতপ্রস্তরটুকুর ্যাতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মুক্তগবাক্ষ দিয়া ফাল্গুনের বাতাস লক্ষণ জোরে বহিয়াই তাহার পরিধানের সাড়িখানির যে অংশ সে পিয়া ধরিতে পারে নাই, তাহা কাঁপাইয়া দিল। আমি যে তখন ম্মাংস দিয়া কুবেরের পূজায় নিযুক্ত ছিলাম, তথাপি আজ কি টা অদম্য শক্তি মনোমধ্যে হইতে উঠিয়া আমাকে একবারে স করিয়া তুলিল। আমি বাহুবেষ্টনে নত মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া

বিকচ প্রফুল্ল পদ্মটীর মত তাহার ঘ্রাণ লইতে যাইতেছিলাম, তখনই মাধবী নিতান্ত ভয়ার্ত্ত হরিণীটীর মত ক্ষিপ্রপদে সরিয়া দাঁড়াইয়া, গ্রীবাটী বক্র অথচ মুখখানা উন্নত করিয়া, চক্ষুতারা যত বড় সম্ভব প্রসারিত করিয়া, অনুচ্চ অথচ স্পষ্টস্বরে বলিল, "বেয়াদব!"

আমি কেবল চাহিয়াই রহিলাম, এমন সুন্দর তআর দেখি নাই।

ঠাকুরমা আসিলেন, জলযোগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ইহার পরের কতকটা কাহিনী আর একজন বলিবেন।

বক্তা—সতীশ চন্দ্র।

(১)

এ কাহিনীর কতকাংশ বলিবার ভার আমার উপর পড়িল। আমি শুভাদৃষ্ট বলিয়াই মনে করি যে ভগিনী মাধবীর জীবন কাহিনী আমি বলিতে পারিলাম।

আমার পিতামহ পীতাম্বর ঘোষ আর মাধবীর পিতামহ জয়রাম বসু দুইজনে একত্র হইয়া পূর্ব্ব বাংলা হইতে কলিকাতায় অর্থান্বেষণে আইসেন। জয়রাম কিছু ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই সাহেব বণিক কোম্পানীর ঘরে চাকরী পাইলেন। তখন কোনও প্রকারে একটু ইংরাজী লিখিতে পড়িতে পারিলে চাকরী পাইতে কষ্ট হইত না। আমার পিতামহ তেমন ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন না। চাকরী না পাইয়া তিনি দালালীর কাজ আরম্ভ করেন।

যতদিন তাঁহার দালালীতে যথেষ্ট উপার্জ্জন না হইত, ততদিন বন্ধু জয়রাম তাঁহাকে অনেক সাহায্যই করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা দুইজনেই যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হইয়া কলিকাতার সহরে বাড়ীঘর করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা আর দেশে ফিরিলেন না, স্ত্রীপুত্র নিয়া কলিকাতায়ই বাস করিতে লাগিলেন।

মাধবীর পিতামহ কলিকাতায় একটী বাড়ী ও কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। একটী মাত্র পুত্র তাঁহার, সহরের আব-হাওয়ায় মিশিয়া সকল রকম কদাচারেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং ত্রিশ বৎসর বয়স অতিক্রম না করিতেই, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিষজীর্ণ দেহখানি রক্ষা করিয়া ইহকালের জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইলেন। মাধবীর মাতাকে শাঁখা সিন্দুর পরাইয়া ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই আমরা নিমতলা ঘাটে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। মাধবীকে কোলে আঁকুড়িয়া ধরিয়া তাহার বৃদ্ধা পিতামহী এই নিদারুণ দুঃখ দৈন্য সহিয়া রহিলেন।

আমাদের পিতার আমরা তিনটী পুত্র, পিতা মারা গিয়াছেন, মাতা আছেন, আমরা পূর্ব্ব কথা ভুলি নাই। আমাদের সুখ সম্পদ কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। বাবা রুগ্ন ছিলেন, বাড়াইয়া গোছাইয়া তুলিতে পারেন নাই বটে। আমার দুই দাদাই ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়া বড় চাকরী করেন, আমি কলেজে পড়ি।

আমরা মাধবীকে ঠাকুরমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। বৃদ্ধা আমাদের সংসারে থাকিয়া আমাদের অন্নদাসী হইতে চাহিলেন না। আমাদের বাড়ীতে পৃথক ভাবেই বাস করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানের চালচলনে আমাদের ঘরে খাদ্যাদি ব্যাপারে ষোলআনা শাস্ত্রবিধি মানা চলিত না, লক্ষ্মীবার, মঙ্গলবারের আটক বাধাগুলিও আমরা সমান করিয়া লইয়াছিলাম, গঙ্গাজলের চেয়ে কলের জলই স্বাস্থ্যকর, সুতরাং পবিত্র

মনে করিতাম। মাধবীর ঠাকুরমা সেই অপরাধে আমাদের ঘরে কিছুতেই জল খাইতেন না। ঠাকুরমা একলাটী হইয়াও আমাদিগকে একঘরে করিয়াছেন বলিয়া আমরা খুবই হাসিতাম, কিন্তু আমাদের মা তাঁহাকে ভক্তি করিতেন যথেষ্ট।

প্রায় বছর দশেক এমনি কাটিয়া গেল, মাধবী বিবাহ যোগ্যা হইলে, ঠাকুরমা আমাদিগকে ধরিলেন মেয়েটার একটা ব্যবস্থা তোমরা করে দাও। এ পাপ আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও।

আমরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম, মাধবী রূপে গুণে যেমন মেয়ে, সে রূপ মনোমত বর মিলে না। মাধবীর আর কেউ নাই, এই দোষে মাধবীর রূপগুণের উপর কেহ দৃষ্টি বসাইতে পারে না। অথবা পৃথিবীর লোক প্রায়ই বর্ণান্ধ, খাঁটিরূপ কাহারও দৃষ্টিতে ফোটে না। দৃষ্টি যে মন-রাজার আজ্ঞাকারী, সে যেমন দেখায়, তেমনি দেখে। তবে যদি কোনও চক্ষু রাজার আইন না মানিয়া বিদ্রোহী হইয়া বসে, সে স্বতন্ত্র কথা। তবে এই রাজাজ্ঞা না মানা যতটা গল্পে শোনা যায়, কাজে তার অনেক কমই ফলে। যাক, মাধবী বড় শীঘ্র শীঘ্র বড় হইয়া উঠিল. পক্ষান্তের তটিনীর মত মাধবীর রূপগঙ্গা যেন উথলিয়া উথলিয়া বাড়িতে লাগিল। আর সকলে বলিলেন, যা হয় একটা দিয়ে দে, আর ত মেয়ে আইবুড় রাখা যায় না। আমি বলিলাম, তা হইতেই পারে না, মাধবীর মত মেয়েকে অপাত্রে দেওয়া যেতে পারে না। না হয় বিয়ে নাই হবে। ওর স্কুলের পড়া শেষ হলেই. আমি ওকে কলেজে ভর্ত্তি করে দেবো। এত বড় ষোল আনা কড়ায় গণ্ডায় হিন্দু হইলেও, ঠাকুরমা ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন না। মাধবীকে অযোগ্য পাত্রে দিতে গেলে তাঁহারও যে অতি মর্ম্মস্থলে টান পড়ে। একদিন মাধবীকেই বলিলাম, "কেমন রে মাধবী, বিয়ে না হইলে চল্‌বে ত?"

সাধারণ মেয়েদের মত মাধবী মুখচোরা অতি লাজুক মেয়ে কোনও দিনই নয়, এজন্য আমরা তাহাকে পাগলী বলিতাম, কখনও কখনও লজ্জাহীনা অসভ্য বলিয়া মিষ্ট তিরস্কারও করিতাম। মাধবী বলিয়াছিল, "মেয়ে মানুষগুলোকে আপনারা জোর করে লাজুক বানিয়ে রাখেন। তারা লজ্জা মুশ্‌ড়ে থাক্‌লেই পুরুষ বাবুদের সুবিধা কিনা, খেলার পুতুলটার মত যখন যেমন ইচ্ছা নাচাতে পারেন।" আমি বারো বছর বয়সের আগেই মাধবীর মুখে এই কথাটা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম, এবং কথাটাকে অতি সত্য বলিয়াই আমি মানিয়া লইয়াছিলাম। আজ যখন মাধবীকে বলিলাম, "বিয়ে না হ'লে চল্‌বে ত?" মাধবী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "সবে এই তের বৎসর বয়সে সে কথা কি করে বলি বলুন?" আজ কিন্তু কথাটা বলিয়াই মাধবী নীচের ঠোঁটখানি দাঁতে চাপিয়া ধরিল! তের চৌদ্দ বৎসর বয়সটা সহজে ঝাড়িয়া ফেলা যায় না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমরা যে হয়রাণ হয়ে গেলুম।"

"বিধাতার পরে আড়ি দিয়ে হয়রাণ হওয়াই মান্‌ষের স্বভাব। তবে আপনাদের পায়ে পড়ি, এমন পালে পালে কলেজের ছেলে ডেকে যাচাই কর্ত্তে আর আন্‌বেন না।"

"সে দিন যে ছেলেটা এসেছিল, বেশ ছেলে, কিন্তু তার মা যে রাজি হচ্ছে না।"

"আপনি ত বলেছিলেন, কলেজের শতকরা আটষট্টি জন ছেলের রক্তে বিষমাখা।"

"তা হলেও বাকি ক'জন ত ভাল আছে?"

"অগাধ সমুদ্রে লক্ষ সামুক খুঁজে মুক্তার ঝিনুক খোঁজা ত সহজ নয়, মিছিমিছি, সমুদ্রে না নামাই ভাল।"

"যাঃ! ফাজিল বকাটে মেয়ে!" বলিয়া ছোট করিয়া একটাচড় মাধবীর পৃষ্ঠে মারিলাম, মাধবী আর একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর একটা কথা বলে আমি লজ্জায় চুপ মেরে যাব। কথাটা কি ছোট বাবু, বিয়ে না হয় নাই বা কর্ত্তুম, তবে বিয়ে করার মতন ধন দৌলত, রূপগুণ নেই বলে বিয়ে হলো না, এ অপবাদটা মনে হলেই কেমন কেমন লাগে!" কথাটা বলিয়াই মাধবী মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম মুখখানা তার লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাসিকাগ্রে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়াছিল। নারী প্রকৃতিটা এমন করিয়া দমাইয়া দিতে বালিকার যেন কঠোর পরিশ্রম হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুরমার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। দুইদিন একটু সামান্য পেটের পীড়ায় ভুগিয়াই বৃদ্ধা গঙ্গাযাত্রা করিলেন। মাধবী কাঁদিয়া আকুল হইল। আমরা যথারীতি বৃদ্ধার সৎকার্য্য করাইয়া, মাধবীর দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধাদিতে যথারীতি অনুষ্ঠান করিলাম। মাধবী একখানা পাশ বই মার হাতে দিয়া বলিল, "এর থেকে পাঁচশ টাকা তুলে ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী ভোজন করান।"

মা বলিলেন, "না না, মোটেত হাজার দুই টাকা, তার পাঁচশ তুলে কাজ নাই, তোরত কোনও অবলম্বন নেই মাধবী।"

"কি নাই আমার জ্যাঠাইমা? আমার সবই আছে। ঠাকুরমা বলে গেছেন, যার কেউ নাই, তার আছেন ভগবান্; আপনারা আমাকে কেউ-না থাকা—কিছু না থাকা করে দিন।"

মাধবী কাঁদিয়া বাড়ীর লোক পাগল করিয়া দিল। তাহাই করিতে হইল, টাকা তুলিয়া কাঙ্গালীদিগকে এক পোয়া চাল, একখানা কম্বল ও চারিটী করিয়া পয়সা দান করা হইল।

(২)

মা একদিন আমার পড়ার ঘরে গিয়া বলিলেন "দেখ্ সতীশ, এই মাধবী মেয়েটাকে কি করবি বল্ দিনি ?"

আমার পরীক্ষার দিন নিকট, ফাষ্ট ক্লাস্ একখানা সার্টিফিকেট না নিতে পারিলে আমার যে কিছুতেই চলিবে না ; দাদাদিগের মত সাহেবের অধীনে কলম পেশা আমার চলিবে না। আমার জীবনের লক্ষ্য প্রফেসারী করা। একটু বিরক্ত হইয়াই মাকে বলিলাম, "আমার কি এখন ও সব কথা শুন্‌বার সময় ? দাদারা আছেন, বলুন না ?"

মা তবু চুপ করিলেন না, পরীক্ষার্থী পুত্রের সময়ের মুল্য তিনি বুঝিলেন না। বলিলেন, "মাধবীর বর কোথাও মিল্‌বে না।"

"না মেলাই উচিত।"

"আমি বলি কি, আমার ঘরেই থাক।"

"বেশত, তাই থাক্।"

কথাগুলি বলিতেছি নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে, মাকে তাড়াইতে পারিলেই হয়। মা আর বাজে কথার সময় পাইলেন না।

মা আবার বলিলেন, "দুটো মিনিট, আমার কথা শুনে উত্তর দে। শোন্, এ ভাবে কি পরের একটা বয়স্থা মেয়ে রাখা যায় ?"

"তাই ত আমি বল্‌ছি, ওকে কলেজের বোর্ডিংএ রেখে দেওয়া যাক।"

মা যেন রাগিলেন, বলিলেন, "শোন্ গাধা, আমার ছোট বউমা-লক্ষ্মীর আসনটা এখনও খালি আছে, আমার ইচ্ছা মাধবীকে আমি সেইখানে বসিয়ে দেই।"

ভারতবর্ষটা এই সকালেই স্বাধীনা হইয়া গিয়াছে, এ খবরটা পাইলেও বুঝি আমি এত বিস্মিত হইতাম না।

"বলো কি মা?"

"কেন? দোষ কি! ভদ্র ঘরের মেয়ে, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দী! একটু সরলা, তাই আমরা মুখরা বলি,—নইলে মাধবীর মত বুদ্ধি ত আমি ঝি বউএর দেখি না।"

"কি লাভ হবে মা?"

"লাভের কি দরকার আমার। ছেলে কি আমার অভাবে আছে না! অক্ষম?"

আমি একবারে বিস্ময়াহতই হইলাম, মাতার মুখের প্রতি সাবধনা দৃষ্টিতে চাইলাম, সন্দেহের লেশমাত্র ছায়াও ত তাহাতে দেখিলাম না। এই ত সেদিন একটা সম্বন্ধ আসিয়াছিল, নগদে অলঙ্কারে তৈজসে বিশ হাজার টাকারও উপর, তবু মা সেই সঙ্গে আরও পাঁচটা ফরমাইস করিলেন। আর আজ একি কথা মায়ের? বলিলাম, "তুমি এমন হয়ে গেলে কিসে মা?"

মা বলিলেন, "কি জানি কেন? যে দিন মাধবীকে তার ঠাকুরমার শ্রাদ্ধদিনে কাঙ্গালীদিগকে চাল বেটে দিতে দেখেছি, পরণে ভিজে নীলাম্বরী খানি, চক্ষুদিয়া জলের ধারা বহিতেছে, মাধবী দু'ধারে সা'র-দিয়ে বসা কাঙ্গালীর ভাঁড়ে চাল ঢেলে দিচ্ছিল, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। অমত করিস না বাবা, এ লক্ষ্মী আমি পরের ঘরে দেব না। কি বলিস?"

এত বড় একটা অসম্ভব কল্পনা মায়ের মনে জাগিবে, আমি তা কখনই ভাবি নাই ; বলিলাম, "যাও তুমি, আমার বিয়ের কথা কি আমারই মতে হবে নাকি ? দাদাদের গিয়ে বল।" মা প্রফুল্লমুখে চলিয়া গেলেন। আমি কেবল ভাবিতে লাগিলাম, মাতৃগৌরবে যখন আমি এত বড়, তখন যদি সংসারের কোনও দুষ্টশক্তি আমায় নরকের তলেও টানিয়া লইয়া যায়, তথাপি আমার ভয় নাই। মা! তুমি বড়, তা জানি, কিন্তু এত বড়, তাত জানিতাম না। বারাণসীর গঙ্গাতীরে তোমার নামে কত বড় মঠ তুলিলে, তোমার এ মহত্ত্বের নিদর্শন রাখিতে পারিবে তোমার এ অযোগ্য সন্তানেরা ?

সে দিনকার পড়াশুনাটা মা একবারে মাটি করিয়া দিলেন। তবে মা বড় বুদ্ধিমতী, আমার পরীক্ষার মধ্যে বাড়ীর মধ্যে কথাটার একটুও আভাস কাহারও মুখে পাইলাম না, মাধবীর মুখ দেখিয়াও নয়। মাধবী তেমনিই নিঃসঙ্কোচে সকলের মত আমার সেবা যত্ন করে, আমার কিন্তু কেমন একটু লজ্জা সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। আমার ভাবটা একটু বাঙ্গাল ধরণের চিরদিনই আছে। তবে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, মাধবীর মুখে যেন কেমন একটু আশ্বিনের কুয়াসা ঢাকা চাঁদের মত ছায়া ছায়া ভাবটা বসিয়া গিয়াছে। মাধবী যেন তেমন অবাধে আর হাসিতে পারে না।

আমার পরীক্ষাটা যে দিন শেষ হইল, সে দিন বাড়ী আসিয়াই দেখি কথাটা বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। মা আর সহিয়া থাকিতে পারেন নাই। সন্ধ্যার পর বড় বউদিদির ঘরে আমার ছোট বোন, বউদিদিরা দু'জন আর মাধবী খুব বক্তৃতাই আরম্ভ করিয়াছেন। কথাগুলি শুনিতে আমার কৌতূহল হইল, একটা জানালার পাশে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম,—মাধবী যেন কেমন ধরা গলায় স্পষ্ট

উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল, "আপনার কথাটা আমার এমন ভাবে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন, আপনারা স্ত্রীজাতি ত? নারী হ'য়ে নারীর মূল্য এত তুচ্ছ মনে করেন? এইটা আশ্চর্য্য! এই জন্যই এ দেশটায় নারীগুলি পুরুষের অন্নদাসী হয়ে আপনাদের স্বত্তাটাই হারিয়ে ফেলেছে।"

বড় বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, হ'বে ভাল, ঠাকুরপো'ও যেমন তর্কবাগীশ, তুইও তেমনি কথার ফোয়ারা—বেশ মিলেছে!"

মাধবী যেন নিতান্ত আহত স্বরেই বলিল, "ছি ছি কথাটা একটু ভেবে বল্‌বেন। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপনারা আমায় নিতান্ত পথে পড়া পেয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছেন, আপনারা বড় উদার ভাবে, মস্ত বড় লাভের দিকটাও না চেয়ে, আমাকে এমন সুখ সম্মানের পদে তুলে নিচ্ছেন, যার আমি কিছুতেই যোগ্য নই। কিন্তু আমি আবার অন্যরূপ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমি ধনজনে দরিদ্র হলেও আমার যত সামান্যই হউক কিছু একটা মূল্য অবশ্য আছে, আমি কিছুতেই স্বীকার করি না, যে আমার কিছু মাত্রও মূল্য নাই। আপনাদের এই দয়ায় আমার যে মূল্যটা একবারে কিছু না হয়ে যায়। এই ঐশ্বর্য্য সম্পদের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে. আমার যে ক্ষুদ্র স্বত্তা তা আমি একবারে কিছু না করে দিতে ইচ্ছা করি না। এই যে সহরময় বড় বড় অট্টালিকা কত অহঙ্কারে দাঁড়িয়ে আছে, এর মাঝে আবার দুই একখানা ছোট খোলার ঘরের অস্তিত্বও এখনও বজায় আছে। ওর মধ্যেও গৃহস্থ খায় দায়, ঘুমায়, হাসে, কলহ করে, তা বলে সে এ আবর্জ্জনা ভেঙ্গে ফেলে, ধনবানের ঐ নিরর্থক প'ড়ে থাকা বারাণ্ডায়, বা রাজা মহারাজের ধর্ম্মশালায় পড়ে থাকতে ত যায় না। যে যায়, সে অতি ভাগ্যহীন। তবে সে চেষ্টা করে, তার কুঁড়ের উপর নিজে কোঠা গড়্‌তে।"

আমার ছোট বোনটা একটু বোকা ধরণের, সে বলিয়া "মাধবী দেখ্‌ছে, রূপের ফাঁদে ত চাঁদ ধরেই ফেলেছে, এখন একটু নেলা খেলা কচ্ছে, শিকারী বিড়ালের অমনিই স্বভাব।"

মাধবী যেন গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল, "দেখুন, যাঁকে লক্ষ্য করে এই অতি কুৎসিত কথাগুলি আপনারা তুলছেন, তিনি দেবতা, আমি তাঁর পায়ের ধূলারও যোগ্য নই, আমি সারাজীবন দাসী হয়ে তাঁর সেবা কর্ত্তে অপমান বোধ করি না, প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা ঠাকুরের মত তাঁর পায়ে আমি ঢেলে রেখেছি, কিন্তু এত বড় বিনিময় আমি কিছুতেই কোরবো না আমি নারীত্ব দেবো না।"

ছোট বউদিদি বলিলেন, "পাগলটা বলে কি? মা দেখি স্যাকরা ডেকে পাঠিয়েছেন, অলঙ্কারের বায়না দিতে।"

মাধবী আবার বলিল, "তবে একটা সোজা কথা শুনুন, এই অলঙ্কার গুলি পরে আপনাদের সঙ্গে যখন মিশে বেড়াব, তখন আমি যখন দেখ্‌তে পাব, এতে আমার পিতৃকুলের দাগটী মাত্র নাই, তখন অভিমানে আমি এতটুকু হয়ে যাব না? পৌষ মাসে পাথার হাওয়ার মত ঐ সোণা মণির পরশে আমার কি কখনও স্বস্তি বোধ হবে?"

বড় বউদিদি এবার একটু গম্ভীর হইয়াই বলিলেন, "এর ভিতর যেন আরও কিছু আছে মাধবী।"

"তা ত আছে বউদিদি।" বলিয়া মাধবী ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়াই, আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম দেখিতে পাইল। মাধবী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আমি দ্রুত পদে চলিয়া আসিলাম।

আসিয়া ভাবিলাম, ব্যাপারটা কি? মাধবীর কথাগুলি অতি সত্য, কিন্তু একটা বালিকার এত প্রগল্‌ভতা যে সহনীয় নয়।

পরদিন মধ্যাহ্নের আহারাদি সারিয়া, যে যাহার ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, যাঁহাদের আফিস্ আছে, তাঁহারা আফিসে গিয়াছেন, আমি আমার পড়ার ঘরে বসিয়া ভাবিতেছি, একটু পড়িব, না ঘুমাইব, না বন্ধুদিগের বাড়ীতে গিয়া তাস খেলিব। মাধবী আমার ঘরে প্রবেশ করিল। আমি দেখিয়া চমকিত হইলাম। মাধবী অল্প অল্প কাঁপিতেছে, দেহের মৃদু কম্পনে তাহার পরিণত অঙ্গের রূপচ্ছটাও যেন কম্পিত হইতেছে, যেন ভাদ্রের ভরানদী শরতের জ্যোৎসনায় সমুজ্জল হইয়া মৃদু-সমীরে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। তাহার দেহের শোণিত প্রবাহ যেন প্রবল গতিতে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া তাহার ললাট কপোল চিবুক পর্য্যন্ত লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে, বালিকা যেন কি এক অতি দর্পী বিপক্ষের সম্মুখে তাহার সমস্ত শক্তি সংযত করিয়া দাঁড়াইয়াছে,—যেন কি এক জীবন মরণের সময়ে বীরাঙ্গনা দাঁড়াইয়াছে। মাধবী কথা বলিতে যাইতেছে, পারিতেছে না, রক্তাধর কাঁপিতেছে, চক্ষে অতি উজ্জ্বল জ্যোতিরশ্মি বিস্ফুরিত হইতেছে! তাহার ললাটের ঘর্ম্ম নাসিকা গড়াইয়া গণ্ডে নামিয়াছে! একি মূর্ত্তি মাধবীর? তাহাকে ত দু'দিন আগেও ছুটিতে খেলিতে দেখিয়াছি, পাগলী বলিয়া তাহাকে কত রাগাইয়াছি! আজ এ কি নূতন মূর্ত্তিতে কোনও প্রভাময়ী দেবী আমার গৃহে আবির্ভূতা হইলেন। আমি ডাকিলাম "মাধবী?"

মাধবী আমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। "আপনি আমায় রক্ষা করুন।" বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমার বিস্ময়ের অবধি নাই; বলিলাম, "কি? বল।"

মাধবী ধীর স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "আমি অপরে বাগ্‌দত্তা" মাধবীর হাতে আমার পা ছোঁয়া ছিল, পা সরাইয়া লইয়া বলিলাম, "বাগ্‌দত্তা! অনুরক্তাও?"

"হ্যাঁ।"

মাধবী তাহার বাম হস্তের মুষ্টি হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ।ধরিল। কাগজ লইয়া পড়িয়া সকলই বুঝিলাম। সত্যই বলিতেছি, অন্যমনস্কভাবে পথে চলিতে চলিতে সহসা কোনও বাধার আঘাত লাগিলে আকস্মিক ব্যথাতে যেমন মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞানশূন্য করিয়া দেয়, তেমনি একটা আঘাত যেন বুকের মধ্যে বাজিল। কিন্তু পরক্ষণে সামলাইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, সন্তুষ্ট হলাম।"

কথাটা যেন ইংরেজী ধরণে বলিলাম, মাধবী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, এবার সে পা দুখানি আমার জোরে জড়াইয়া ধরিয়া, স্পষ্ট রোদন-বিকল-স্বরেই বলিল, "আপনি আমার পরম পূজ্য ভ্রাতা, দাদা! দাদার উপর বোনের যে অধিকার সে অধিকার আপনার আমাকে দিতে হ'বে। আমায় আপনার বোনের যোগ্য করে নিতে হবে।"

মাধবীর চক্ষুজলে আমার পা ভিজিয়া উঠিল, হৃদয়ের যা কিছু একটু ময়লা ছিল তাহাও বুঝি কাটিয়া গেল। স্বচ্ছন্দে বলিলাম, "তোমার মত বোন পাওয়াই গৌরব, বল বোন্‌টী, বিজয় কি রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছেন?"

"তা জানি না, আজ ছ'মাস্ কোনও খবরই রাখি না।"

"আচ্ছা, আমি এখনি বেরুচ্ছি।" তখনই জামাটা টানিয়া পরিতে যাইতেছিলাম, মাধবী আমায় বলিল, "মাকে কিরূপে শান্ত করি দাদা?"

"আমি ফিরে এসে তাঁকে সকল কথা খুলে বল্‌বো।"

"কত ব্যথা পাবেন তিনি!"

ভাবিয়া মাধবীর কথাটার অর্থ বুঝিলাম, অর্থাৎ মা কত নিঃস্বার্থ করুণায় দীন হীন কন্যা মাধবীকে কত আদরে কুড়াইয়া লইতেছিলেন,

মাধবী আজ সে আদর উপেক্ষা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে, এ চিন্তাটা আপাততঃ উঠিয়া মাকে ব্যথা দিতে পারে বটে। ভাবিয়া বলিলাম, "আচ্ছা এর উপায় করবো।

তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

(৩)

"বিজয় কুমার সিংহ," কাঠের গোলা খুজিতে লাগিলাম। কোথাও পাই না অবশেষে সংবাদ পাইলাম, সে গোলা এখান হইতে উঠিয়া বহু বাজারের মোড়ে উঠিয়া গিয়া বি, সিং টিম্বার মার্চেণ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সে দিকেই ছুটিলাম।

দোতালার একটা সজ্জিত সুন্দর কক্ষে বি, সিং কারখানার আফিস ঘর, দরোয়ান কবাটের স্প্রিং ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিল। দেখিলাম হুবহু একজন খাটি সাহেবই গম্ভীর বদনে বসিয়া বর্ম্মা চুরুট হাতে বহি পড়িতেছেন, আগেই বইখানা দেখিয়াই চিনিলাম, রেঁালার নভেল, তাহাতেই বুঝিলাম সাহেব কাঠ ঘাটিয়া একবারে কঠোর কাঠ না হইয়া কতকটা নীরস দারুর মতই সম্মুখে প্রভাত হইতেছেন। আমি সুপ্রভাত বলিয়া অভিবাদন করিলাম। সাহেব আমার পদ শব্দ পাইবামাত্রই মুখ তুলিয়া আমার দিকে যেন কিছু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই তাকাইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি অভিবাদন করিলে তিনি চক্ষু নামাইয়া অভিবাদনটা ফিরাইয়া দিয়াই বলিলেন, "বসুন দয়া করে, কি চান?"

আমি বাংলায় বলিলাম, ইংরাজী কথা গুলিতে কতকগুলিয়ে, "প্লিজ্" "থ্যাঙ্ক ইউ" বাজে বকুনি দিতে হয়, ওটা আবার নেহাৎ রস ভঙ্গের মত বোধ হয়। বিশেষ আমি আসিয়াছি নিতান্ত একটা বাংলা কল্পনা লইয়া, সাহেবের বর্ণ যতই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হউক, পোষাক পরিচ্ছদে সাগর পারের কায়দায় কোনও ত্রুটী না থাকিলেও, ঠোঁটনাড়া, হাতনাড়া চোক্ চাওয়া কোনওটীতে একসূত বেখাপ না লাগিলেও, আমিত এটা বুঝিয়াছি, এরূপ দেহের গঠন সে ইঙ্গভূমির বাতাসে সম্ভবে না, কিম্বা ফিরিঙ্গি পুরুষেও এমন বিশুদ্ধ অবিমিশ্র রূপ সম্ভবে না। সাহসে বাংলা ভাষায়ই বলিলাম, "বসাটা দয়া করে নয়, আপন গরজেই বসেছি, চাই কি, তা আর দুই একটা কথার পরে বলবো।"

ভদ্রলোক যেন শিহরিয়া উঠিলেন, স্বচ্ছন্দ বাংলা ভাষায়ই বলিলেন, "আপনি নেবুতলার দিকটা হতে এসেছেন?" আমার বড় আনন্দ হইল, বলিলাম, আপনি কি এমনি কিছু আশা করেই ছিলেন?"

"সেইরূপই সম্ভব। কিন্তু আমি বড় অপরাধী।"

"নিশ্চয়ই, তবে রেঙ্গুন থেকে কবে এসেছেন?"

"প্রায় একমাস হলো।"

"এক মাস হলো? একমাসেও আপনার কাজের ভিড় যায় নাই?"

"কাজের ভিড় আমার আছে, কাজ কিছু করি না, কাজে মন দিতে পারবো,—আপনাদের শুভ পরিণয়টা হয়ে গেলে।"

"আমাদের পরিণয়? আপনি এত সংবাদ রাখেন?"

"মাধবীর ঠাকুরমার মৃত্যু হয়েছে, মাধবী আপনাদের আশ্রয়ে আছে, আপনারা সে নিরাশ্রয় বালিকাকে আশ্রয় দিয়াছেন, এরূপ অনেকেই দেয়। আপনার দেবী স্বরূপিনী জননী যে তাকে সেধে পুত্রবধূ কর্ত্তে যাচ্ছেন, তার জন্ত তাঁর পায়ে কত প্রণাম কর্ত্তে ইচ্ছা হয়! সে প্রণাম আমি আপনাকে

দিয়েই তাঁকে পাঠাচ্ছি।" বলিয়া অত বড় সাহেব আমার পা ধরিতে যাইতেছিলেন, আমি তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম, "আপনি এত সংবাদ রাখেন? তবে মাধবীর সঙ্গে একবার দেখা করেন নাই কেন?"

"আমার অধিকার নাই, সে অধিকার আমি রাখি নাই।" বলিয়া মিষ্টার সিংহ যেন হাঁপাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমায় বলিলেন "চলুন, বাহিরে কোনও মুক্ত বাতাসে গিয়া সমস্ত বলিব।" ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "ছটো বেজেছে; তবু চলুন লাল দীঘির পাড়ে একটা কুঞ্জবনে ব'সে, সমস্তই বল্‌বো। বল্‌বার আমার প্রয়োজন হয়েছে।"

এখন বিজয় সিংহের মুখেই আপনারা সকল কথা শুনুন।

বক্তা—বিজয় সিংহ।

(১)

বাহাদুরী কাঠের দেশ ব্রহ্মে যাইতে জাহাজে চড়িলাম। সাগরে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা ত অবিরাম অনন্ত, আমার বুকের মধ্যেও তাহার চেয়ে কম তরঙ্গ খেলিতেছিল না। চব্বিশ বৎসর বয়স,—প্রণয়, ভোগ বিলাসের তরঙ্গ যে দুই একটা উঠিতেছিল না, এমন নয়, তবে সবার

উপরে ছিল ধন লালসা। ধনে বড় আমাকে হইতেই হইবে। কলিকাতা মহানগরীর এই যে বড় বড় সজ্জিত সৌধ, যাহার অধিকাংশেই ইউরোপীয় বা মাড়োয়ারি বণিকেরা অধিকারী, আমরা বাঙ্গালী কেবল চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হই। বাঙ্গালী বাবু, ব্যারিষ্টার, রায় সাহেব রাজা বাহাদুর ভাড়া করা প্রাসাদে দু'দিন রাজত্ব বিছাইয়া, দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইয়া বাঁচিয়া যায়, আমি দেখিব, অমনি খাঁটি অধিকারে সহরে দাঁড়াইতে পারি কি না।

আমি ছিলাম বড় দরিদ্র, পেট পুরিয়া খাইতেও পাই নাই। ধনবানের দ্বারে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়াছি। আমার এই অনবেক্ষ স্বাস্থ্য, রূপে আমাকে লোকে অনুপম বলে, বুদ্ধির প্রখরতা নিশ্চয়ই আছে, নচেৎ এ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিব কেন? তথাপি ধনে খাটো বলিয়া সামান্য দশ হাজার পাঁচ হাজারের লোকও আমায় অবহেলা করিত। বাবা আমাকে অযত্ন করিয়াছেন, টাকা দিয়া তাঁহাকে খুসি করিতে পারি নাই বলিয়া,—মামারা অবজ্ঞা করিয়াছেন, আমি রোজগারে অক্ষম বলিয়া, কাকা তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, অক্ষমের ভার বহিতে হইবে বলিয়া। মোদ্দা সংসারে স্নেহ মমতার আস্বাদ আমি পাই নাই, কেবল টাকা আমার নাই বলিয়া। কিন্তু ভগবান অবিচারী নন্, তিনি আমায় টাকার পথ দেখাইয়া দিলেন। আমার অন্ন বস্ত্রেব অভাব ঘুচিল, ইচ্ছা করিলে এখন আমি সারা জীবন পরিবার পরিজন লইয়া দুধে ভাতে থাকিতে পারি। কিন্তু ব্যাঙ্কে দু'পাঁচ লাখের চেক যখন তখন কাটিতে পারি, ঐ শ্বেতাঙ্গ দাম্ভিকের দল টুপি তুলিয়া আমার ভাণ্ডার দ্বারে সেলাম করিয়া যাইবে এমনটা আমাকে করিতেই হইবে।

সতীশ বাবু কথার মধ্যে বাধা দিয়া বলিলেন, "আর সেই লক্ষ্মীর মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হবে মাধবী?"

না না, ও সব তরল কল্পনা আমার কথনও ছিল না। জাহাজ হইতে নামিয়া মাটিতে পা দিবার পর মাধবী কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। একটা ভাল বাড়ী দেখিয়া, বড় সরাই দেখিয়া বাসা লইতে হইল। তাহারই পাশে একজন ব্রহ্মদেশীয় সাহেবের বড় বাড়ী, চারিদিককার দারুময় মনুষ্য পিঞ্জরের মাঝখানে এই সৌধভবনটী অতি বড় মাতব্বর মহারাজের মতই উন্নত-শিরে আত্মগৌরব প্রচার করিতেছিল। বাংলায় হইলে ইহার প্রতাপে বাঘে মহিষে একঘাটে জল খাইত। অনুসন্ধানে জানিলাম, এই সাহেব বড় একটা সেগুন বাগানের আংশিক মালিক। ইহার সঙ্গে আলাপ করিবার প্রয়োজন হইল।

প্রথম দিন সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা হইল না, তাঁহার কন্যার সঙ্গে দেখা হইল। কন্যাটী যুবতী, সুন্দরীও বটে, বিলক্ষণ আলাপ কুশলা। আমার সঙ্গে অবাধে আলাপ করিল। আমি ব্যবসায়ের কথাই পাড়িলাম। বিলক্ষণ বড় মেজাজে বড় আস্‌বাব লইয়াই গিয়াছি, বড় হইয়াই বলিলাম, আমি এক লক্ষ টাকায় কাঠ বায়না করিব, বৎসরে দশ লাখ টাকার কারবার চালাইতে চাই। যুবতী হাসিয়া বলিল, "মোটে এক লাখ টাকা, আমার পিতা কি রাজি হইবেন? আচ্ছা, আমি না হয় একটু অনুরোধ করিব আপনার জন্য।" আমি একটু আঘাতই পাইলাম। বলিলাম "না না, আপনি আমার জন্য অনুরোধ করিতে কেন যাইবেন? আমি না হয় অন্য কোথাও চেষ্টা করিব।" সে সুন্দরী আমার কথায় দুঃখিত হইল না; বলিল "না না, পিতার সঙ্গে দেখা না করিয়া আপনি অন্যত্র যাইবেন না। পিতা আমার কথা খুব শুনিয়া থাকেন; আপনার মত লোকের সঙ্গে ব্যবসায়ে সম্বন্ধ রাখিতে পারিলে আমরা খুসীই হইব, সত্যই আপনার কাজ করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্টই হইব।" আমি বলিলাম, "ধন্যবাদ!

কিন্তু এত অল্পক্ষণের পরিচয়ে আপনার এ অহৈতুক সহানুভূতি আমি বিশ্বাস করিতে পারি কিরূপে ?”

যুবতী হাসিল, রক্তরাগ-সমুজ্জ্বল ওষ্ঠাধর দুটী চম্পক দলের মত অতি মৃদু কাঁপাইয়া কেমন একটু হাসিল, সহস্র সুন্দরী হইলেও আমাদের দেশের যুবতীরা অমন হাসিতে জানে না। হাসি যেন আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া দিল। আমি কিন্তু তাহাতে বিহ্বল বা বেসামাল হই নাই। বলিলাম, “কথাটা ভদ্রোচিত না হইতে পারে, কিন্তু সত্য।” যুবতীও বলিল, নিশ্চয়ই। এমন সত্য বলিয়া বীরের মত কথা বলিতেত আপনাদের ভারতবাসী জানে না। আপনি গুজরাটী না রাজপুত ? আমি বলিলাম, “আমি বাঙ্গালী।”

“বাঙ্গালী ? বাঙ্গালী কি ?”

“ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সভ্য জাতি।”

“হ্যাঁ, ঠিক, মনে পড়েছে, বাবা বলেছেন, বাঙ্গালী বড় বিদ্বান্ জাতি, তারা না হ’লে দপ্তরখানা চলে না, আমার কোন বাঙ্গালীর সাথে আলাপ নাই, মাপ কর্‌বেন।”

আমি বলিলাম, “তবে আজ আপনার সুপ্রভাত বল্‌তে হবে, একটা নতুন জানোয়ার দেখ্‌লেন।”

“নিশ্চয়ই ! আপনারা তবে এমনি খাঁটি সাহেবও হ’তেই পেরেছেন ?”

“কথাটা ঠিক বুঝলাম না, মাপ চাই।”

“অর্থাৎ ঠিক আমাদের মতন পোষাক পরেছেন, আমাদের মতনই কথা বল্‌ছেন, আমার ত বিশ্বাস ছিল ভারতবাসীরা এমন পারে না।”

প্রগলভার কথাটা একটু তিক্ত লাগিল, আমিও বলিলাম, “আপনি কি খাঁটি ইউরোপিয়ান্ নিভাঁজ স্যাক্‌সন ?”

যুবতী এবার ক্রুদ্ধ না হইয়া আরও হাসিল, বলিল, "আপনার কি মনে হয়?"

"আমার ত সন্দেহ হয়।"

যুবতীর মুখখানা আহ্লাদে যেন খুব নাচিয়া উঠিল। "এ সন্দেহ কিসে হলো আপনার?" বলিয়া যুবতী বিশেষ উৎসুক নেত্রে আমার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "তা বল্‌বো না, বলা বেয়াত্বিব।"

যুবতী তার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত করিয়া গম্ভীর করিয়াই বলিল, "আমিই আগে বেয়াত্বিবী কচ্ছি, আপনাকে বল্‌তেই হবে, কিসে আপনার মনে এ সন্দেহ?"

আমি অগত্যা বলিলাম, "অবিমিশ্র ব্রিটন বা স্যাক্সন রক্তে এমন চক্ষু গড়ে ওঠে না।"

যুবতী যেন বড়ই খুসী হইল, বলিল, "আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই। আমি পিতাকে আপনার জন্য অনুরোধ করবোই। সাত দিন পরে পিতা ফিরবেন। এ সাত দিন আপনি কোথায় থাক্‌বেন?"

"আমি নিকটেই একটা কাঠের বাড়ীর একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি।"

"কি বোকা? ঐ বড় হোটেলটা দেখতে পান নি?"

"আমি সাহেবের হোটেলে খাই না, নিজে ঘরেই পাক ক'রে খাই।"

"আশ্চর্য্য! তা হ'লে দিনে ৪।৫ ঘণ্টা আপনার রাধ্‌তে খেতে চলে যায়? এমন অলস লোকের ত ব্যবসা করা পোষায় না। পিতা শুন্‌লে আপনাকে কারবারের লোক বলেই পছন্দ কর্‌বেন না।"

যুবতীর কথাটা চিন্তার বিষয় হইল বটে। প্রকৃত পক্ষে ভোজন ব্যাপারের বাঁধা বাঁধি বা ছুঁয়াছুঁয়ি ভাবটা আমি বিশেষ ভাবে কথনই মানিয়া চলি না। ব্যয়ের সংক্ষেপ হইবে বলিয়াই এ বন্দোবস্তটা করিয়া-

ছিলাম। এই যুবতীর কথায় বুঝিলাম, এটা আমার ভুল হইয়াছে, কাজেই ভুল শোধরাইতে বলিলাম, "আপাততঃ এই ভাবে দাঁড়িয়েছি, এখন দেখে শুনে যা হয় করা যাবে।"

অভিবাদন করিয়া বিদায় হইতেছিলাম, যুবতীটী বাধা দিয়া বলিল, "আপনি ত জেনে গেলেন না, আপনার সন্দেহটা ঠিক কি না?"

আমি বলিলাম, "অতটা কৌতুহল আমার নাই।"

"তবু আমি বল্‌ছি, আপনার সন্দেহ ঠিক। আমরা পর্তুগীজ, আমার মায়ের মা শুনেছি বাঙ্গালীর মেয়ে ছিলেন, মায়ের বাবা তাঁকে কেড়ে এনেছিলেন। আমার বাবা ব'লে থাকেন, এই পুরুষেও আমা থেকে ভারতের গন্ধ উঠে যায় নাই।"

আমি কৌতুহলের নেত্রেই আবার তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলাম এবং বলিলাম "অবশ্য আপনার সততই চেষ্টা যা'তে এই গন্ধটা মুছে যায়।"

"ও, আপনার বেয়াদবিটার অনেক প্রশ্রয়ই দিয়েছি।"

যুবতী এবার রোষকটাক্ষই করিল। আমি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলাম।

(২)

হোটেলে বাসা লইলাম না। আহাদির ব্যবস্থা সেইখানেই করিলাম। চাকরটা বিদায় করিয়া দিলাম। সত্যই সময় অনেক বাঁচিয়া

গেল, খরচও খুব বাড়িল না; শ্বেতাঙ্গ মহিলাটীর পরামর্শটী মূল্যবান্ বলিয়াই গ্রাহ্য করিলাম।

সকাল বেলায় চা পান করিতে বসিয়াছি। আমার পাশেই একজন গুজরাটী ও আর একজন বার্মিজ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। সাহেবেরা সকলে শ্বেতাঙ্গ না হইলেও, খানিকটা দূরে বসিয়া আভিজাত্যটা রক্ষা করিতেছেন। সে দিনকার সেই যুবতী মিস্ রোজি জোসেফও তাহাদের মধ্যে আসিয়া বসিল। বসিয়াই আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে মিষ্টার সিং, সাহেবদের হোটেলে এসেছ, জাত থাক্‌লো কই।" এই বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শ্বেতাঙ্গব্যক্তিকে বলিল, "এই বাঙ্গালী যুবকটী বেশ চলনসই ভদ্রলোক।"

অমি অভিবাদন করিলাম মাত্র, বাক্যালাপ করিলাম না। অতদূরে বসা লোকের সঙ্গে আলাপ করা আমি মর্য্যাদার হানিজনকই মনে করিলাম, চা পান সারিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ছোট একটা নদী বা স্থতির ধার দিয়া জারুল গাছের ছায়ায় ঘুরিতেছি; মিস্ রোজি আসিয়া বলিল, "আজকার সকালটা বেশ মিষ্টই বটে!"

আমি বলিলাম, "পূর্ব্ব দেশের সকাল বেলা সকলটাই এমনি, এ ত শীতে জড় শড় পশ্চিম দেশ নয়। আরও এ এপ্রিল মাস।"

"তার চেয়ে আরও আজ এমন সময়ে আপনার সঙ্গে বেড়াবার আনন্দাস্বাদের সুযোগ পাওয়া গেল।"

"ধন্যবাদ, আমার সঙ্গ কি আপনার এত মিষ্ট?"

"নিশ্চয়ই, আপনার চেহারাটা আমার মিষ্টই লেগেছে।"

"সহস্র ধন্যবাদ!"

মিস্ রোজি কতক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া কি ভাবিল, তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা বলুন ত, আপনার জীবনের লক্ষ্য কি?"

আমি দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিলাম, "আমার জীবনের লক্ষ্য অর্থ—অর্থবান্ হওয়া।"

"আপনি টাকাই খুব ভালবাসেন?"

"নিশ্চয়ই, টাকার চেয়ে কাম্য বস্তু আমার কিছুই নয়।"

"আমরা কিন্তু শুনেছি, এই পূব দেশের লোকগুলি বিশ বছর না হ'তেই বালিকাদের ভালবেসে বসে। আপনারা নাকি ভালবাসার জন সাথে পেলে রাস্তায় পড়ে অনাহারে দিন কাটাতে পারেন।"

"হ্যাঁ, আমাদের ভালবাসা এমনি পবিত্র ও মধুর বটে, তবে আমি ও সবে নাই।"

"বেশ, আপনার তবে কিছু আশা আছে।"

এমনি ভাবে রোজীর সঙ্গে আমার বিশেষ ভাবে মেলা মেশা চলিতে লাগিল। ক্রমে জানিলাম রোজী যাহাকে পিতা বলে, তিনি রোজীর প্রকৃত পিতা নন, রোজীর মাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী; তবে রোজীকে তিনি বড়ই ভালবাসেন। ক্রমে আরও জানিলাম, রোজী একজন মার্কিন যুবককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু যুবক এক দিন কথাচ্ছলে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, রোজী পিতৃহীনা নিতান্ত দরিদ্র বালিকা, তাই দয়া করিয়া সে তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। যুবকের এইরূপ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রোজী তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে। সে এমন কাহাকেও স্বামী করিবে না যে তাহাকে কোনও অংশে ছোট বা হীন বলিয়াই মনে করিবে। সংসারে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু, স্ত্রীলোকের সেই হচ্ছে স্বামী, পুরুষের পক্ষে স্ত্রীও তাহাই। এতে আবার স্নেহ দয়ার কি আছে। স্ত্রী যদি তার স্বামী-বন্ধুর প্রতি দয়াবান দাতার নজরেই চেয়ে থাকিবে, তবে তাহার স্বাধীনতা কোথায়, সুখই বা কি?

রোজীর এ কল্পনাটুকু আমার মন্দ লাগিল না। এখন সত্যই এমন হইল, রোজীর সঙ্গ আমার বড়ই প্রীতিকর বোধ হইল, কাজ কর্ম্মের অবসরে তাহাকেই মনে পড়িত, সে'ও যেন স্মরণ মাত্র আসিয়া আমাকে কত গল্প করিয়া আনন্দ দান করিত। প্রবাসে এমন সৎসঙ্গ সৌভাগ্যের বিষয়ই বলিতে হইবে।

রোজীর পিতার সঙ্গে আমার ব্যবসায়ের কথায় পাকাপাকি হইয়া গেল। আমি প্রতি বৎসর ৬ লক্ষ টাকার বাহাদুরী কাঠের রপ্তানি লইব, বর্ত্তমানে এক লক্ষ টাকার অর্ডার লইতেছি, পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিতেছি, আর পঞ্চাশ হাজার ৪ মাস পরে দেয়। কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া যখন ব্যাঙ্কের কথা উঠিল, তখন মিষ্টার যোসেফ্ শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা ঈশ্বর, তবেই ত হয়েছে, আপনার ব্যাঙ্ক।যে লাল বাতি জ্বেলেছে, শুন্‌তে পান নাই?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, সাহেব একখানা টেলিগ্রাম আমাকে বাহির করিয়া দেখাইলেন। আমার পায়ের তলে পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল। কোনও প্রকারে সে স্থান হইতে আমার বাসাবাড়ী পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিলাম, ছোট কাঠের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে, পা পিছলাইয়া গিয়াছিল। তার পর দু'দিনের খবর কিছু রাখি না।

যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন বুঝিলাম আমার বাম পায়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা। বড় পিপাসা, জল চাহিলাম। একখানি সুন্দর হাতে আমার মুখে ছোট গ্লাসে করিয়া সরবৎ ঢালিয়া দিল। দু'তিনবার চাহিয়া চিনিলাম, রোজী আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছে। তখন একবার মাধবীর কথা মনে হইল, আমি যদি এই নির্ব্বান্ধব দেশে মরিয়া যাই, তবে মাধবীর কত কষ্ট

হইবে? আর এই রোজীই বা কত ব্যথা পাইবে। কিন্তু যেমন আরও একটু জ্ঞান হইল, অমনি আমার সর্ব্বনাশের কথা মনে পড়িল,—ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া আমার আশার বাসা চুরমার হইয়াছে।—আমার আকাশ কুসুম কল্পনা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; এর চেয়ে আমার মরণই মঙ্গল!

মরিলাম না, রোজী আমাকে বাঁচাইয়া তুলিল। সেই নির্ব্বান্ধব মগের মুলুকে শ্বেতাঙ্গমহিলা সকল রকম শ্রম কষ্ট উপেক্ষা করিয়া, প্রতিক্ষণ আমার সেবায় নিযুক্ত থাকিত, তাহারই সেবায় আমি বাঁচিলাম। কিন্তু বাঁচিয়া লাভ কি? কলিকাতার গোলা হইতে খবর গেল, ব্যাঙ্ক ত ফেল হইয়াছে, অধিকন্তু যাহার উপর গোলার ভার দিয়া আসিয়াছিলাম, সে যাহা হাতে পাইয়াছে, লইয়া পলাইয়াছে। গোলার সরকার মহাশয় আমাকে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে পত্র লিখিয়াছেন।

আমি রোজীকে স্পষ্টতঃ বলিলাম, আর ফিরিব না, সাগর জলেই এ দেহ রক্ষা করিব। রোজীও স্পষ্ট বলিল, "না, তোমার ভয় নাই প্রিয়তম, আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে, তোমাকে দিচ্ছি, তুমি কারবার ঠিক করো। কিন্তু বলো, তুমি আমার হবে?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বুঝিলাম না এ যুবতী বলে কি? বলিলাম, "আমি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না তোমার কথা ভদ্রে?"

রোজী বলিল, "কথা আর কিছু নয়, তুমি আমায় বিবাহ কর। আমি স্বাধীনা মিষ্টার যোসেফ্ আমার পিতা নয়, জান ত। আমার পিতার আশী হাজার টাকার আমি একাকিনী অধিকারিণী। যে টাকা লাগে নাও, চল আমরা কলিকাতায় চলিয়া যাই, তবে এই খানেই আমাদের বিবাহ কার্য্যটা একটা গির্জ্জায় গিয়া সম্পন্ন হয়ে যাক।"

হায় মাধবী! মাধবীর কথা মনে পড়িল! কিন্তু আমি যে টাকার শোকে মরিতে বসিয়াছি, মাধবীর কথা ভাবিবার আমার সময় কই। মাধবীর বিবাহে দশ হাজার টাকা লাগিলেও আমি দিতে পারিব, বাংলায় এমন শিক্ষিত বরের অভাব কি হইবে যে, দশ হাজার টাকায় না কিনিয়া দিতে পারিব।

রোজীকে গির্জ্জায় গিয়া বিবাহ করিলাম। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করা আমি নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করি। ধর্ম্মালোচনা-প্রবৃত্তি আমি মানুষের একটা মানসিক দুর্ব্বলতা মনে করি। বিশ্বসৃষ্টির কর্ত্তা কেহ থাকেন ভালই, তাহার জন্য মানুষের ভাবিবার কি আছে? যখন হিন্দু ধর্ম্মে থাকিয়াও, কোনও দিন হরিনাম কালীনাম করিবার অবকাশ পাই না, তখন খৃষ্টসমাজে নাম লিখিলেই বা ক্ষতি কি? খৃষ্ট বা কৃষ্ট কিছুই আমি বলিব না ইহা ঠিক।

সমস্ত ঠিক হইলে, সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছি। এ দেশটার কি একটা মোহিনী শক্তি। গঙ্গার তীরে নামিয়াই আমি কেমন হইয়া গেলাম। মাধবীকে স্মরণ করিয়া আমার প্রাণ যেন কি একটা যাতনায় জ্বলিয়া উঠিল। বালীগঞ্জে বাড়ী ঠিক করিয়া রোজীর সংসার পাতাইয়া দিতে হইল, বাঙ্গালী টোলার কারবার তুলিয়া সাহেব টোলায় আনিতে হইল। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও আমি মাধবীকে ভুলিতে পারি নাই।

অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, মাধবীর ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন, মাধবী আপনাদের আশ্রয়ে আছে। মাধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। তবু একদিন ও পাড়ায় একটা হোটেলের ছাদে দাঁড়াইয়া মাধবীকে ছাদে দাঁড়ান দেখিয়াছিলাম। মাধবী সুখী কি দুঃখী, তাহা অতদূরে থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না।

তাহার পর সেদিন শুনিতে পাইলাম, মাধবীর সঙ্গে, আপনার বিবাহ স্থির হইয়াছে। আপনারা মহাশয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি শুধু নিরাশ্রয় বালিকা মাধবীকে আশ্রয় দিলেন না, আমাকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। আপনার কাছে আমার বড় অনুরোধ, বিবাহের দিন বন্ধুভাবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিবেন, আমি যদি যৎ সামান্য উপহার দিতে পারি, আপনারা গ্রহণ করিবেন।

সতীশ বাবু এতক্ষণ কথাগুলি খুব তন্ময় হইয়াই শুনিতেছিলেন, এক্ষণে বলিলেন, "আপনার উচ্ছিষ্ট বস্তু যে আমি, গ্রহণ কর্‌বো, তা কি একটা ভাববার বিষয় নয় ?"

আমি বড় ব্যথা পাইলাম, সতীশ বাবুর হাতখানি ধরিয়া বলিলাম, "ঈশ্বর সাক্ষী করে বল্‌ছি, মাধবী নিষ্কলঙ্ক পবিত্র কুসুম, আমি তাকে কোনও দিন স্পর্শও করি নাই।" তবু সতীশ বাবু আমাকে ক্ষমা করিলেন না বলিলেন, "আপনিত ঈশ্বরই মানেন না, তবে আবার ঈশ্বর সাক্ষী কি ?"

এবার আমি জবাব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার তখনকার মুখ দেখিয়া বোধ হয় সতীশ বাবুর দয়া হইল, তিনি নিজেই বলিলেন, "মানুষ তর্ক করিতে গিয়া, যত বড়ই নাস্তিক হউক না কেন, দায়ে পড়িয়া তাহাকে এমন অবস্থায় আসিতে হয়, তখন সে মনের অজ্ঞাত-সারেই একটা কিছু অজ্ঞেয় অবাচ্য শক্তির উপর নির্ভর রাখিতে বাধ্য হয়। এই শক্তিই ঈশ্বর, ইহাই নিয়ন্তা।"

এই বলিয়া সতীশ চন্দ্র আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিবারও অবকাশ পাইলাম না।

বক্তা—মাধবী।

(১)

আমার কাহিনী আমাকে কিছু বলিতে হইবে বই কি? সতীশ দাদা সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্তও গৃহে ফিরিলেন না, তাঁহার মা ত ভাবিয়া অস্থির হইলেন। আমি কত ভাবিলাম, তাহা বলিয়া বুঝাইব কি? যখন তিনি গৃহে ফিরিলেন, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিশ্রী গম্ভীর মুখভঙ্গি দেখিয়া মা বলিলেন, "কি রে সতীশ? কি হয়েছে? কোনও অসুখ বিসুখ করেছে না কি?" দাদা বলিলেন, "না, অসুখ আর কি? অনেক ঘুরেছি, তাই পরিশ্রম হয়েছে। বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" খাইতে বসিলেন, বাড়া ভাতের অর্দ্ধেকও খাইলেন না। কোনও প্রকারে হাত মুখ ধুইয়া শয্যা লইলেন।

হা জগদীশ্বর! এত চিন্তা ভারত হৃদয় পাতিয়া কখনও লই নাই। যে চিন্তাভারের একটুও কাহাকে বলিয়া লাঘব করিবার উপায় নাই, সে ভার এ ষোল বৎসরের প্রাণ কিরূপে সহ্য করিবে? মাথা ঘুরিতে লাগিল, বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া তন্দ্রা আসিতে লাগিল। তাহাতে কত রকম দুঃস্বপ্ন কুস্বপ্ন দেখিলাম।

রাত্রি এক প্রকার কাটিয়া গেল। কিন্তু দাদার ত সাক্ষাৎ পাই না, তিনি প্রত্যূষেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে গৃহে আসিয়া অতি সংক্ষেপে আহারাদি সারিয়া আবার কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রিতে আসিয়া স্বীয় শয়ন কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন হায়! হায়! সতীশ দাদা! তুমি এত শিক্ষিত, এত উদার? আমার উপর

এত স্নেহশীল! কিন্তু এ কি নিষ্ঠুরতা তোমার! আমি তোমার বালিকা ভগিনী, কত যাতনায় পলকে যুগ গ'ণিয়া আমি দিন কাটাইতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না? আমি যে অকপটে তোমায় দাদা ডাকিয়াছি, এত বড় বিচক্ষণ হইয়াও কি তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না!

আর ত লজ্জা সঙ্কোচ করিলে চলে না। আমি যে নিতান্ত অসহায়া একাকিনী দুরন্ত দুর্ভেদ্য গহন বনে ঘুরিতেছি, কত বড় অন্ধকার! বুঝি কত হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক আমার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে! সাহস অবলম্বন আমাকে করিতেই হইবে! দ্বিপ্রহরে দাদা স্নানের ঘরে স্নান করিতেছিলেন, আমি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলাম। দাদা আমাকে হাত ধরিয়া কাঁদিয়াই বলিলেন, "এখন না, রাত্রিতে সকলে ঘুমালে আমার ঘরে যেও।"

বিস্ময় আরও বাড়িল, তবু সাগরে পতিতের কূল দেখার মত একটু ভরসায় নির্ভর পাইলাম। সে রাত্রি আসিতে যে কত বিলম্ব হইল, তাহার মাপ কাঠি তুচ্ছ ও ঘড়ির কাঁটায় সম্ভবে না, বড় একটা যুগের ভাঙ্গাগড়া ইহার মধ্যে ঘটিয়া যাইতে পারে।

সকলে ঘুমাইল কি না জানিনা, আমি দাদার দ্বারে আঘাত করিলাম। দ্বার অর্গল বদ্ধ ছিল না, খুলিয়া গেল। সুইচ টিপিয়া আমিই আলো জ্বালিলাম। দাদা শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। তিনি ডাকিলেন, "মাধবী?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে!"

"কি শুন্‌তে চাও?"

আমি দাদার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম—

আমার উত্তর না পাইয়া দাদা বলিলেন, "সংবাদ শুভ হলে কি আমি এত বিলম্ব করি?"

আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম, দাদা আমার হাত ধরিয়া তাঁহার বিছানার পাশে বসাইলেন। আমি অনেক কষ্টে বলিলাম, "ভেঙে করে বলুন, আমি সইতে পারবো।"

"তোমার বিজয় নাই?"

"সেই নির্ব্বান্ধব বিদেশে—।"

"হ্যাঁ, মরেছে সে।"

একি কঠোর কণ্ঠস্বর দাদার! এমন রুক্ষ স্বরেত এমন সংবাদ কেউ বলে না। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুটী যেন জ্বলিতেছে, যেন কোনও মহাশত্রুর উদ্দেশ্যে সে প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ, সম্মুখে পাইলে তিনি যেন তাহাকে পলকে নখছিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেন। আমি চাহিয়াই রহিলাম। তিনি অতি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মরেছে সে, কিন্তু দেহটা তার চিতায় পুড়ে ছাই হয় নাই, বা পচে গলে মাটী হয়েও যায় নাই। তার প্রেতাত্মা তার দেহ নিয়ে এখনও লীলা কচ্ছে! সে মরণের কথা শুন না বোন্ ভুলে যাও।"

এ কোন্ সমস্যা! দুঃখের সঙ্গে রাগ হইল। একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিলাম, "দাদা! এ ত হেঁয়ালীর সময় নয়, স্পষ্ট করে সমস্ত বলুন।"

দাদা স্পষ্টই বলিলেন, "বিজয় রেঙ্গুনে এক ফিরিঙ্গি যুবতী বিয়ে করে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে।"

যে কণ্ঠে কথাটা বাহির হইল, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার স্থান ছিল না, তবু আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম "বিষয়টা আমায় খুলে বল্‌তে হবে।"

দাদা বিছানার নিম্ন হইতে একখানা কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই কাগজখানা পড়, অত কথা ত খুলে বল্‌তে পারি না।"

কাগজখানা আদ্যোপান্ত পড়িলাম। পড়িয়া তাহা বিছানায় পত্র রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সত্যই বলিতেছি, অনেকটা সুস্থই হইয়াছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, লোকটা বোধ হয় সেই বিদেশে বিনা যত্ন সেবায় মারা পড়িয়াছে, দাদা যাহাকে মরণের চেয়ে দুর্ঘটনা মনে করিতেছেন, আমি ঠিক তেমনটা বুঝিলাম না। তিনি যদি ধনবতী নারী বিবাহ করিয়া যথেষ্ট ধনের অধিকারী হইয়া থাকেন, সে মন্দ কি, তিনি অর্থের কাঙ্গাল, তা ত আমি জানি।

আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া, দাদা বলিলেন, "এখন কি কর্ত্তে চাও ?"

কথাটা যেন আমার মনের উপর তপ্তলৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। আমার যে এই আকস্মিক এত বড় দুঃখ, এ আঘাত যেন তাহাকেও ছাপাইয়া গেল। সতীশ চন্দ্র কি এত অধম, আমি যে সত্যিকার দাদা বলিয়া তাঁহাকে ভাবিয়াছি, ডাকিয়াছি। তিনি কি আমার এই ঘৃণিত দেহ পিণ্ডটার জন্ত এমনি লালায়িত! তবু আমি যতটা পারি সংযত হইয়া বলিলাম, "কি বলেন ?"

"এখনও কি তুই সেই নরাধমের অনুরক্ত ?"

"নিশ্চয়ই! কায়মনোবাক্যে ।"

"আশ্চর্য্য !"

আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। পোড়া বাড়ীটায় এমন একটু নিরিবিলি যায়গা পাই না যে, একটু বসিয়া ভাবিয়া দেখি ব্যাপারটা কি হইল। তখনও বাটীর লোকগুলি ঘুমায় নাই। আমি গিন্নীমার কাছেই শুইতাম, তিনি ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, রাত্রি জাগিলে আমার অসুখ হইবে। তাঁহার ধারণা আমি পড়ার ঘরে বসিয়া তখনও পড়িতেছি। অসুখ হইয়াছে, রাত্রিতে খাই নাই; তিনি যে

আঙ্গুর বেদানা লইয়া বসিয়া আছেন। রাগ হইল অনেক, তবু তাঁহার কাছে গিয়া শুইতে হইল। আঙ্গুর বেদানাগুলিও সব গলধঃকরণ করিলাম, না করিলে বুড়ীটা ছাড়ে না, সাত রকম কৈফিয়ত চায়। তার চেয়ে সেগুলি অধঃকরণ করাই ভাল মনে করিলাম। কিন্তু আমার মনে বাজিতেছে, সতীশ দাদার সেই শেষ কথাটা, "আশ্চর্য্য!" শুইয়া পড়িলাম, আশ্চর্য্য ইহাতে এমন কি আছে? কি এমন অন্যায় বিজয় করিয়াছেন যে আমি তাঁহার উপর জন্মের মত বিরক্ত হইয়া যাইব। সেই নির্ব্বান্ধব বিদেশ, কেউ নাই সেখানে দরদের জন, জীবনের হাড় জল করা টাকাগুলি পলকের মধ্যে উড়িয়া গেল, জীবনের এত বড় আশা তাঁহারি চূর্ণ হইয়া গেল, টাকার কষ্ট তিনি অনেক পাইয়াছেন, তাই ত টাকা তিনি অতি ভালবাসিতেন। সেই দারুণ টাকার শোকে তিনি মরণাপন্ন হইলেন; সেই শঙ্কট সময়ে একজনে প্রাণ দিয়া তাঁহাকে সেবা করিয়া বাঁচাইল। তার পর তাহার সর্ব্বস্ব ধন রত্ন তাঁহাকে ডালি দিল, এ অবস্থায় তিনি যদি সেই ভাগ্যবতীর করায়ত্ত হইয়া থাকেন, তবে এমন অন্যায় আশ্চর্য্য কি হইয়াছে? কত বড় মহান উদার হৃদয় সেই ফিরিঙ্গি রমণীর!—যে অর্থহারা শোকাকুল দেখিয়া এক বিজাতীয় বিদেশী পুরুষকে সর্ব্বস্ব দিয়া তাহার শোকে সান্ত্বনা দিল। এ ক্ষেত্রে তিনি যদি তাঁহার সম্মান রক্ষা না করিতেন, তবে কি যোগ্য হইত! বিজয় ত হীন অধম পুরুষ নন। কোনও দিনই ত তিনি হৃদয়ের অমর্য্যাদা করেন নাই। তিনি ত সেই বিজয়, মাঘের শীতে নিজে কাঁপিয়া ঠাকুরমার গায়ে নিজের র‍্যাপারখানি জড়িয়া দিয়াছেন। বিজয় নারীর সম্মান, প্রেমিকার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, সে নারী নিশ্চয়ই পরমা সুন্দরী, বিখ্যাত বিদুষী, কত মধুর সেবায় তিনি বিজয়ের তাপদগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়াছেন। বিজয়ের ভুবনমোহন রূপ,

বিশ্বমোহন স্বভাব, মধুর কণ্ঠস্বর, তাহাতে না মুগ্ধ হয় কে? তাইত সে যুবতী মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন! আশ্চর্য্য কি? তবু আমি যে তাঁহারই অনুরক্তা, এই কি আশ্চর্য্য! আমি তাঁহাকে পাইলাম না, তাঁহার ঘরে গৃহিণী হইয়া সংসার পাতিতে পারিলাম না, আশার আকাশ কুসুম দিয়া যে কল্পনার মন্দির রচনা করিয়াছিলাম তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। সংসারে সকলের আশা পূর্ণ হয় না! স্বামীর ঘর করা ছাড়া কি নারীর আর কোনও সাধ আহ্লাদ আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না? এক পুরুষে অবহেলা করিল, আবার অন্য পুরুষের আশ্রয় না লইলে রমণীর জীবন চলিবে না? এ ত নারীত্বের বড় অবমাননা। ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছিল বিজয়কে, ভালবাসিয়াছিলাম, তিনিও ভালবাসিয়াছিলেন, আজ তিনি দায়ে পড়িয়া প্রবলার করগতা হইয়াছেন। কত নারীর স্বামী জেলে আটক হয় না। এই ত সেদিন কতগুলি পুরুষ দেশ স্বাধীন করিবার পাগলামি করিতে গিয়া, চোর ডাকাত না হইয়াও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গেল, তাই বলিয়া তাঁহাদের যাঁহারা প্রেমিকা, তাহাদের কথা কি তাহারা একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার বিজয় নিশ্চয়ই আমাকে ভুলিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে ভুলিব কেন? যাক না কিছুদিন, তিনি যখন খুব বড় লোক হইবেন, কত বড় অট্টালিকা তাঁহার হইবে, গাড়ি ঘোড়া দাস দাসীতে ঘর ভরা থাকিবে, তখন আমি একদিন তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিয়া আসিব প্রাণাধিক, তুমি আমার কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইও না, আমি ভালই আছি।

সমস্ত রাত্রি অনেক ভাবিলাম। প্রভাত হইল, সূর্য্যটা উঠিল, যেন আগুনের কুণ্ড হইয়া। সহরের কাকগুলি ডাকিল যেন মড়কের ঘোষণা করিয়া। ময়লাটানা গাড়িগুলি যেন আছড়াইয়া গড়াইয়া মরিতেছে। জন কোলাহল যেন বিশ্রী কলহ করিয়া উঠিল। আলোক

দেখিয়া ভাবনাটা আর একদিকে ছুটিল। এখন আর এখানে থাকি কি করিয়া? এত লোকের মুখ দেখাদেখি করিয়া, কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা বাদে উত্তর কাটিয়া এখন এখানে থাকি কি করিয়া? যাই বা কোথায়? এত বড় দুনিয়াটায় কি আমার যাইবার স্থান নাই? হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ সবই ত আছে, যে জন মনের মত তাহাকে পাইলাম না বলিয়া আমার স্থানই পৃথিবীতে নাই? দাসী হইতে গিয়াছিলাম, দাসীত্ব পাইলাম না বলিয়া কি জীবনের কোনও মূল্যই আমার নাই? দাসত্বই কি জীবের একমাত্র লক্ষ্য? লতা দাসত্ব চায় বৃক্ষের, নদী দাসত্বের জন্য ছোটে সাগরোদ্দেশে, ফুলও বুঝি বাতাসের দাসত্ব যাচিয়া তাহার গন্ধ ছড়ায়, আবার মানুষ দাসত্বের ভিক্ষায় তার চেয়ে বড় মানুষের দ্বারে ঘোরে। নারীও সেই নিয়মে নরের দাসীত্ব আশায় পতঙ্গের বহ্নি পরশের মত উড়িয়া পড়িয়া ছট্ ফট্ করিয়া মরে। এ যদি সৃষ্টি নিয়ন্তার নিয়ম হয়, আমি সে নিয়ম ভঙ্গ করিব। এমন কি কেউ করে না? কত চোর ডাকাত নরঘাতক বিশ্বকর্ত্তার নিয়ম মানে না, তবু তাহারা এই বিশ্ব জগতেই বাস করে।

সে দিনটা গেল। সবাই আমায় আদর করিতে আসে, আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, আমার চোক্ বসিয়া গিয়াছে। রাখিয়া দাওনা তোমাদের আদর যত্ন স্নেহ মমতা, ও সব বাজে মিথ্যা কল্পনায় মজিবার সময় আমার নাই। সতীশ দাদার কাছে গেলাম, বলিলাম,—স্বচ্ছন্দে স্পষ্ট স্বরে চোক তুলিয়া বলিলাম, "দাদা, তোমার সেই "আশ্চর্য্য" কথাটার জবাব দিয়া যাই নাই, আজ জবাব দিতে এসেছি।"

দাদা যেন কত কাতরেই বলিলেন, "উত্তর দিতে হবে না মাধবী, আমি উত্তর পেয়েছি।"

"তবে আপনি আমায় স্নেহ করেন?"

"বোন্‌কে কোন্‌ ভাই স্নেহ না করে ?"

"তবে আমার একটা উপায় করুন।"

"কি উপায় কর্‌বো, বলো।"

"আমি ছোট, কিছুই ত জানি না দাদা, তাইত তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি তোমায় বোর্ডিংএ রেখে পড়্‌তে দেবো, তুমি রাজি আছ ?"

"নিশ্চয়ই, এইত তুমিই আমার উপায় করে দিলে, এমন ত আর কেউ পার্ত্ত না। তবে আজই, দেরী করা চল্‌বে না।"

দাদা তখনই বাহির হইলেন, আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। সকলে অবাক্‌ হইয়া তাকাইয়া রহিল, কেহ কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ পাইল না। সতীশ দাদা বাড়ীর গাড়িতে বড় চড়িতেন না, আজও চড়িলেন না। একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া আমারে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

আমি একটা মেয়ে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইলাম, দাদার সুপারিশে।

(২)

পর বৎসরই পরীক্ষায় পাশ করিয়া ফেলিলাম। সতীশ দাদা আসিয়া বলিলেন, "আমি আমেরিকা যাচ্ছি, যাবি মাধবী ?"

আমি বলিলাম, "যাব দাদা, আমায় নিয়ে যেতেই হবে।"

খানিকটা গাড়িতে চড়িয়া জাহাজে চড়িলাম। সমুদ্র বড়ই চমৎকার। এত বড় বিরাট সে, কোনও দিকেই তাহার স্রোত নাই, সে আবার

কোন্ ক্ষুদ্রের দিকেই ছুটিতে যাইবে? সূর্য্যের তপ্ত চাহনীতে সে ফুলিয়া উঠে, অনুরাগে নয়, রাগে, এত বড় বিরাটের বুকে সে আসে আবার রাগ ছড়াইতে! সমুদ্র যখন স্থির, তখন মাটীর চেয়েও স্থির, বুক চিরে জাহাজগুলিকে যাইতে দেয়, নড়েও না; আমাদের নদীগুলি নিতান্ত ছোট, তাইত একখানা ছোট ষ্টিমার গেলেই রাগে আছাড় খাইয়া মরে। কিন্তু সমুদ্র যদি খেপিয়া যায়! বাতাস বোধ হয় সমুদ্রের চেয়েও বড়, সেই পারে সমুদ্রকে খেপাইতে!

একদিন ছোট রকম একটু ঝড় হইল। জাহাজের কর্ত্তা আমাদিগকে কামরায় গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন, স্ত্রীলোকগুলির উপরই তাহার হুকুম কড়া, কেউ ডেকে বেড়াইতে পারিবে না। আমি বলিলাম, তোমার ও জাহাজের সরকারী আমাকে দিলেও আমি করিতে পারি।

একটা মেম একদিন কুটুম্বিতা করিতে আসিল, কিচ্‌মিচ করিয়া বলিল, তুমি ভালবাসার জনের সাথে সমুদ্র-যাত্রায় এসেছ, কি সুখী তুমি?" দাদার সামনে বসিয়াই কথাটা,—মেমটার মুখে একটা চড় মারিলাম, "আমরা ভাই বোন্ দেখ না পোড়ার মুখী।" মেমটা বাঙ্গালীর মেয়ের চড়টা খাইয়া লজ্জায় আর উচ্চ বাচ্য করিল না।

মার্কিন দেশের কথা একটু বলিব বই কি? কেন যে এদেশের লোক বিলাত হইতে সাহেব হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সাহেব ভক্ত হইয়া পড়েন তাহা আমি যথার্থই বুঝিয়া আসিয়াছি। সে স্বাধীন রাজ্যের মধু মাটীতে সর্ব্বত্রই যেন স্বাধীনতার গন্ধ ছুটিতেছে। সকলই স্বাধীন,—মুটে. মজুর, কুলী মেথর সবাই স্বাধীনতায় প্রফুল্ল। সত্যই বলিতেছি, এখানে স্ত্রীপুরুষে মেশামেশি ভাব দেখিলে বিষদৃশ লাগিত, এখনও লাগে, সেখানে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন মোটেই বিরক্তি কর বোধ হইত না।

সেখানে কাহাকেও দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিতে দেখিলাম না। কেবল কাজ, কেবল ছুটাছুটি। একটা বাড়ীর তিনতলায় আমরা বাসা লইলাম, দু'জনের দুটী ছোট ঘর। খাওয়ার ব্যবস্থা হইল একটা হোটেলে। সে দেখি, একটা হিন্দু হোটেল, ডাল ভাত তরকারী মেলে। দাদা যাইয়াই একটা সংবাদ পত্রে চাকরী লইলেন, আমাকে লইয়াই তাঁহার মুস্কিল। চাকরী না লইয়া আমাকে পুষিবেন কি করিয়া। আমি জাহাজে একমাস থাকিয়া দাদার সঙ্গে ইংরাজী কথাবার্ত্তা বলিয়া তখন বেশ ইংরাজী বলিতে কহিতেই শিখিয়াছি, চলিতে ফিরিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। একটা ডাক্তারী স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম; অপরাহ্ণ চারিটায় সে স্কুল বসে, ছাত্র শিক্ষক সকলই স্ত্রীলোক। স্ত্রীরোগের চিকিৎসাই শিখিতে হয়, স্ত্রীরোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়। দশটা রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম খাটিতে হয়। সেখানে ভারতবাসী ছাত্রী আমি ছাড়া তখন কেহ ছিল না, তাহাতেই সেখানে আমার যত্ন আদর বরং আরও বাড়িল, সকলেই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একদিন একটা যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহার জন্য ফাইন দিতে হইল, কিন্তু কর্ত্রী কেমন স্নেহের হাসিটী হাসিয়া বলিলেন, "অসাবধান হয়ো না মা।" অবশ্য ঠিক 'মা' কথাটী বলিলেন না, ইংরাজী শব্দেই বলিলেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে আমি যেন সুমিষ্ট "মা" কথাটীই বুঝিতে পারিলাম।

দাদা সকালে কাজে যান, বারটায় ফিরেন, আবার দু'টায় তাঁহার কলেজে যান, সাতটায় ফিরেন। তিনি দর্শন শাস্ত্র পড়েন। তাহার খাটুনি দেখিয়া আমার দুঃখ হয়, আমারই জন্য তাঁহার এই খাটুনি।

সমস্ত দিনটা একলা ঘরে বসিয়া থাকি, বড়ই বিশ্রী লাগে। আমারই ঘরের সম্মুখে আর একটা মার্কিন মেয়ে থাকিতেন, আজ কদিন দেখিতেছি তিনি অসুস্থ, শুইয়া থাকেন, ইচ্ছা করে কাছে গিয়া

তাঁহার একটু শুশ্রূষা করি, কিন্তু তেমন রীতি নাই,—দাদা বলিয়াছেন। সে দেশে বিনা পারিশ্রমিকে কেহ কাহারও সেবা নেওয়া অপমান বোধ করেন। একদিন সে যুবতী আমাকে হাত ছিনাইয়া ছোট করিয়া ডাকিলেন, আমারই সমবয়সী হবেন তিনি। আমি কাছে গেলে বলিলেন, "আপনি ত সারাদিন বসে থাকেন, কাজ কর্ম্ম কিছু করেন না?"

আমি বলিলাম, "কি আর করবো? সেই ৪টায় স্কুল।"

"চাকরী করবেন?"

"কি চাকরী? কোথায় পাই?"

"আমার একটা চাকরী আছে, দু'দিন আমি অসুস্থ যেতে পারি না, আর দু'দিন না গেলে আমার সে চাকরী থাক্‌বে না। তা হলে আমি বড় বিপদে পড়্‌বো। আপনি যদি একটা সপ্তাহ কাজটা করেন, তবে আমার উপকার হয়, আমি একটু সুস্থ হয়ে নিতে পারি।" আমি ভাবিলাম, ক্ষতি কি! দেখি না কাজটা কি? কিন্তু পারিব কি না সন্দেহ। তিনি বলিলেন, "একটা চায়ের দোকানে চায়ের কাপগুলি এগিয়ে গুছিয়ে দিতে হ'বে। সাতটা থেকে ন'টা কাজ। এখনই রওনা হউন।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি সকলই আমায় বুঝাইয়া দিলেন। আমি তখনই বাহির হইলাম, দাদা তখন ছিলেন না, তাঁহাকে না বলিয়া কাজটায় গিয়া একটু বাহাদুরী করিবারই ইচ্ছা হইল।

সাত দিন কাজ করা হইল, সে ত মুনিবের কাজ করি বলিয়া বোধ হইল না, যেন আপনার কাজই করিতেছি। সাত দিন পরে মাহিনা পাইলাম। এতগুন টাকা, আমাদের দেশে আমার মত মেয়ে সাত মাসেও তাহা কামাইতে পারে না। সাত দিন পরে সেই বন্ধুকে বলিলাম, "এখন আপনি কাজে যেতে পারেন ত?"

তিনি বলিলেন, তিনি আর একটা সুবিধা মত কাজ পেয়েছেন, আমি যদি ঐ কাজটা করি, তবে তিনি সেই কাজে যান। তাঁহার মুখের হাসি আর কথার ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিলাম, আমাকে একটা কাজ দেওয়াই তাঁহার মতলব। আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার কষ্ট বোধ হইয়াছিল।

দাদাকে তখন বলিয়াছি, তিনি আপত্তি করিলেন না। পরে একদিন সেই চায়ের দোকান হইতে আসিবার কালে একটী স্ত্রীলোক বেশ বয়স হইয়াছে, আমাকে বলিলেন, "আপনার আর এক ঘণ্টা সময় হবে কি ?"

জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, তিনি আমার কাছে ভারতের ভাষা শিখিতে চান, শীঘ্রই তিনি ভারত ভ্রমণে বাহির হইবেন। আমি হিন্দী আর বাংলা শিখাইতে পারি বলিলাম। তখনই তিনি আমাকে নিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলেন। এক ঘণ্টা তাহাকে ইংরাজী শব্দগুলির বাংলা ও হিন্দি তর্জ্জমা ইংরাজী হরপে লিখিয়া দিতে হইল। তাহাতে এক সপ্তাহ পরে আর অতগুন্ টাকা পাইলাম। বাহবা দেশ কিন্তু, এ দেশে আমার লোকে বেকার থাকিয়া কষ্ট পাইবে কেন ?

আটটা মাস এই ভাবেই গেল। আমার সেই বন্ধু মিস্ মনির কাছে একটু কৃতজ্ঞতা জানাইব ভাবি, কিন্তু এই আট মাসের মধ্যে অবকাশই পাইনা। তাঁহার দেখাও কদাচিৎ পাই। এক দিন দেখি তিনি বেশ সাজিয়া গুজিয়া আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চলে যাচ্ছি বন্ধু।"

আমি বলিলাম, "কেন ? কোথায় ?"

তিনি সেদিন আধঘণ্টা সময় নিয়াই আলাপ করিলেন। তাঁহার ডিগ্রি নেওয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনা হইবে না। এখন গৃহধর্ম্মে মন

দিতে হইবে। তাহার পিতা তাঁহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। আগামী পূর্ণিমার দিন বিবাহ। বিবাহের পর তাঁহারা আর স্কুল কলেজে পড়াশুনা করেন না। যাইবার সময়ে আমার হাতখানি ধরিয়া বলিয়া গেলেন, "আমার বিবাহের নিমন্ত্রণে তোমাকে কিন্তু যেতে হবে ভাই, আমি কার্ড পাঠাইব। তোমার দাদাকেও পাঠাব, নইলে তুমি একা যেতে পার্‌বে না।"

যথা সময়ে আমেরিকার বড় সহর নিউইয়ার্ক হইতে আমাদের নিমন্ত্রণ কার্ড আসিল। নিমন্ত্রণ পত্রের নিম্নে মিস্‌মণির পিতার নাম লেখা, দাদা পড়িয়া বলিলেন, "এ কি? এ যে মস্ত বড় বড় লোক?"

ভাই বোন নিমন্ত্রণ খাইতে চলিলাম, আমি আমার দেশের নিয়মে সাড়ি সেমিজ পরিয়াই গেলাম। বিবাহ বাড়ীতে গিয়া এ দিক ও দিক দেখিয়া অবাক, আলোক মালার এত ঘটা ত জীবনে কখনও দেখি নাই। ঢোল কাশী বাজিতেছে না বটে, কিন্তু পিয়ান অর্গান বাঁশীর ধ্বনি বড় মিষ্ট বাজিতেছে! দ্বারেই একজন প্রৌঢ় ভদ্র লোক। আমাকে দেখিয়াই হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "তুমি ত মিস্‌ মাধবী।" আমি হাসিয়া বলিলাম "হ্যাঁ!" তখনই তিনি একজন পরিচারিকাকে আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, এটী "মণির একটী ভারতীয় বন্ধু, বড় অন্তরঙ্গ, এঁকে বাসর ঘরে নিয়ে যাও।" দাদার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "নমস্কার, মিষ্টার ঘোষ।" একজন ভদ্র লোককে বলিলেন, "এঁকে সভায় নিয়ে যাও, ইনি একজন ভারতীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এঁর পরিচয়টা বিশেষ করে সকলকে বুঝিয়ে দিও।"

কর্ম্মকর্ত্তা আমাদের এতটা তত্ত্ব লইয়াছেন ভাবিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। ইঁহাদেরও বাসরোৎসবের রীতি আছে। ধর্ম্ম মন্দিরে বিবাহ সম্পন্ন হইলে বাড়ীতে আসিয়া বাসরোৎসব হয়। এত কাল পরে

মার্কিন দেশের বাজে গল্প শুনিলাম। আমরা যত লোক আহারে বসিলাম, কেহুই চুপ করিয়া বসিয়া খাইল না, কেবলই হাসি আমোদ গল্প। মিস্‌মণি এখন মিসেস টুথ আমাকে কাছে বসাইয়া আমার হইয়া সকলকে বলিলেন, ইনি অনেক দূরের লোক, তাই আমাদের সঙ্গে আমোদে মিশ্‌তে পাচ্ছেন না।"

যেমন রাত্রি দশটা বাজিল, অমনি সে উৎসব বাড়ী একবারেই নীরব, একে একে সকলই বিদায় সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেল। আমরাও বাহির হইলাম। ট্রেণে আসিয়া দাদাকে বলিলাম, "এত বড় বড় মানুষের মেয়ে পাঠ্যাবস্থায় চাকরী করিতেন, এটা ত বড় আশ্চর্য্য!" দাদা বলিলেন, "এখানকার সকলই আশ্চর্য্য!" আমি বলিলাম, "এই দেশে থেকে গেলে হয়।" দাদা হাসিয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে, কি নিয়ে থাক্‌বে? ঐ যে আমাদের দু'খানি ঘর, ওর ভাড়া কত জান, সাত দিনে পঞ্চাশ টাকা, অর্থাৎ মাসে দু'শ। এখানে আবার সাত দিন অন্তর দেনা পাওনা চুকান রীতি। আমি অবাক হইয়া গেলাম, এ সব খবর আমি রাখিতাম না। আমিও এখন মাসে প্রায় দুইশ টাকার মত রোজগার করি, সেই চাকরী আছে, আরও স্কুলে আমাদের শিক্ষক ডাক্তারেরা ছোট ছোট রোগীর বাড়ীতে আমাদিগকে কল্ দেন, তাহাতে মাসে মাসে বেশ কিছু পাইতাম। তাহাকে ভাবিতাম, আমার জন্য এখন আর দাদাকে বেগ পাইতে হয় না। এখন ত শুনিয়া অবাক্! অপ্রতিভ হইয়া আর কথা বলিলাম না।

দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিলাম; দাদা কতকগুলি উপাধি পাইলেন, আমিও পাইলাম। দাদা সেই মার্কিন দেশেই মাসে শ তিনেক টাকার একটা কাজ জোগাড় করিয়া আসিলেন। দেশে বসিয়াই ভারতের কথা আমেরিকার সংবাদ পত্রে লিখিবেন, সে সংবাদ পত্রের

কর্ত্তা তাহাকে তিনশ টাকা দিবেন। আমি কেবল লেডি ডাক্তার হইয়াই দেশে ফিরিলাম।

মহাসাগর পাড়ি দিয়া যাই পূর্ব্ব দেশের হাওয়াটা গায়ে লাগিল, সত্যই যেন স্নেহময়ী মা তাঁহার অঞ্চল বাতাসের পরশ সন্তানের গায়ে বুলাইয়া গেলেন। জন্মভূমির ঐ দূর প্রসারিত তরু কুঞ্জের ক্ষীণ রেখাটী দৃষ্টিগোচর হইল, অমনি যেন প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে মনে হইল, বিজয়, আমার বিজয় জানি কেমন আছেন? এতকাল কথাটা একবারে ভুলিয়া না গেলেও মনের মধ্যে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

সহরে আসিয়া ঘর ভাড়া করিয়া লেডি ডাক্তারের সাইনবোর্ড দিয়া বসিলাম। দাদা একটা কলেজের প্রোফেসারি পাইলেন।

(৩)

দুই এক মাস আয় উপার্জ্জন সামান্যই হইল। দুই একটা কল্ যাহা পাই, তাহাতে টাকা পাই অতি সামান্যই। বেশ বড় লোকের বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়াও, ফি দিবার সময়ে তাঁহারা বলেন, তাঁহারা গরীব লোক, আট টাকার স্থলে ৪৲ টাকা নিতে হইবে। বিশেষ আপত্তি করি না, কতই বা টাকার আমার প্রয়োজন, বাড়ী ভাড়ার পর গোটা পাঁচিশেক টাকা হইলেই যথেষ্ট। ঝিটাকে গোটা আটেক টাকা দিতে হয়।

আমার আপন জন নাই, সেইটাই এখন আমার বিশেষ আরামের হইল। সাগরপারে গিয়াছি, বাইশ বছর বয়সেও বিবাহ করি নাই, সুতরাং আমার জাতি নাই ; এ কৈফিয়ত কাহাকেও দিতে হইল না ; কোনও জ্ঞাতি কুটুম্ব সামাজিক স্বজনের সঙ্গে মিশিতে পারি না বলিয়া কোনও রূপ ব্যথা বেদনা বোধ করিতে হইল না। দাদার কিন্তু হইয়াছিল, তাহার ভাইদের সঙ্গে তাহাকে পৃথক হইয়া পৃথক বাড়ীতে বাস করিতে হইল। ভাইএর দুটী কন্যা বিবাহ যোগ্যা ; আমেরিকা-ফেরতা ভাইএর সংশ্রবে থাকিলে হয়ত হিন্দুর ঘরে তাহাদের কন্যার বিবাহ নাও হইতে পারে। মা অনেক বলিয়া কহিয়া ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শোধন করিয়া লইলেন। আমার উপর তিনি যাহা চটিয়া গেলেন, তাহা আর কি বলিব ? তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া পা ছুঁইয়া ফেলিয়াছিলাম, তখনই তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করিতে হইল।

এক দিন ভাবিলাম, বিজয়ের বাড়ীতে গিয়া একবার দেখিয়া আসি না কেন তিনি কেমন আছেন। বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে বেগ পাইতে হইল। তাঁহাকে বৎসরে অন্ততঃ তিনবার বাড়ী বদলাইতে হয়। প্রথমে এক বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম, তিনি এখানে নাই অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া শুনিলাম, সবে কাল তিনি উঠিয়া এল্‌গিন্ রোডে গিয়াছেন। এবার ঠিক ধরিলাম। এক দিন গিয়া বাড়ীটা চিনিয়া আসিলাম, দারোয়ানের কাছে জানিয়া আসিলাম বাবু কখন বাড়ীতে থাকেন। দারোয়ান বলিল সাহেব সকালে বাহির হন, আর রাত্রে দশটার আগে ফিরেন না। তাইত ভাল, তাঁহার সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই ভাল, আগে দেখিয়া লই তাহার ঘর কন্না কেমন চলিতেছে, যে ভাগ্যবতী আমার রত্ন কাড়িয়া লইয়াছেন, তিনি সে অমূল্য মানিক পরিয়া কত গৌরবে আনন্দে দিন যাপন করিতেছেন্!

তবু তাঁহাকে একটু দেখিতে ইচ্ছা করে বই কি ? চকের দেখার অধিকার আমার কে হরণ করিবে ? সাজিয়া গুজিয়া সকলেই বাহির হইতেছিলাম, এমন সময়ে একটা বড় ঘরের ভদ্রলোক আসিয়া আমায় কল্ দিলেন ; না গেলে নয়, তাঁহার কন্যাটী গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছা গিয়াছেন ; তিনি ভয়ে এক বারে মুহ্যমান। যাত্রায় বাধা পাইলাম, কলে যাইতে হইল। সর্ব্বনাশ ! এ যে সাংঘাতিক এক্লামসিয়া রোগ ! আর একটা বড় ডাক্তার ডাকাইলাম। আট দিনের মধ্যে সে রোগী ছাড়িয়া আসিতে পারিলাম না। ডাক্তারটা নামে খুব বড়, পাঁচ সাতটা অক্ষরে তাঁহার টাইটেল, দেহেও খুব মস্ত বড়, একটা হাতীর ওজন হইবে। কাজে দেখিলাম, গোবরগাদার কচু, ছুঁলেই গলা ধরে। সেই রোগীটার সম্মুখে ডাক্তার সাহেব রসিকতা করিতে গেলেন। দুই একবারে সামলাইয়া গেলাম, তৃতীয় বারে তাঁহাকে অমন বাঁকা মুখে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলাম যে, এত বড় দেহধারী হইয়াও তাঁহাকে ভয় পাইতে হইল।

সেখানে এক রাশি টাকা পাইলাম। দৈনিক ৪০৲ টাকা হিসাবে দশ দিন। টাকাগুলি আনিয়া বাক্সে ফেলিয়া আবার শুভ প্রভাতে বাহির হইলাম বিজয়কে দেখিতে।

ট্যাক্‌সি গেটে ধরাইয়া দেখিলাম, ড্রাইভার গাড়ী ঠিক করিয়া গেটে খাড়া রহিয়াছে, নামিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। বিজয় আসিয়া গাড়ীতে চড়িলেন। এ কি ? এ যে কেবল অস্থি চর্ম্মের কাঠামো। সে উর্ব্বসী মনোমোহন রূপ, মধুর হাস্য, স্নিগ্ধ মুখশ্রী কোথায় গেল ! তবে কি কোনও ডাকিনী আমার বিজয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। একটা লাইট পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ীটা ছাড়িয়া দিলে তবে গেটে প্রবেশ করিলাম।

উপরে উঠিতেই একটী পাগড়ী মাথায় চাপরাস আটা "বয়" তাড়িয়ে আসিয়া বলিল, "কাঁহা যাতেহ, উপর জানেক হুকুম নেই।"

"জানে দাও বেতমিজ।" বলিয়া সিড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়িলাম, ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। তিন চারিজন দাস দাসী ছুটিয়া আসিল, এক জন বলিল, "কি চাই মাই?" বলিলাম, "মিসেস্ সিংহকো পাশ মোলাকাত মাংতেহ।" এক জন খবর দিতে চলিল, আমি তাহার পিছেই চলিলাম। দেখিলাম সুন্দর সজ্জিত কক্ষে একটী গৌরাঙ্গী তরুণী চেয়ারে একাকিনী চা পান করিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল, সে যেন নেহাৎ মুস্কিলে পড়িয়াই এখানে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে। সে গরমের দিন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। আমি ঘরে ঢুকিয়া স্লুইস্টা টিপিয়া পাখাটা খুলিয়া দিয়া তরুণীর সম্মুখে আর একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। এই তরুণী আমার প্রণয়ের প্রতিযোগিনী, আমার উপর সম্পূর্ণ বিজয়য়িনী! তবু ইহাকে দেখিয়া আমার বিশেষ রাগ হইল না। এ ত কখনও আমার বিজয়ের যোগ্য হইতে পারে না। এমন বিশ্রী বেদনা-মাখা বিরূপ মুখে সে আনন্দ ধাম এ অধিকার করিতে পারিবে কেন? তাই আমি পরাজিত হইয়াও জেত্রীকে দেখিয়া বিশেষ রুষ্ট হইলাম না। যুবতী খুব বিরক্তি-বিকট মুখেই বলিল, "কি চাই?" আমি হাসিয়াই বলিলাম, "আপনার সঙ্গে একটু দেখা কর্ত্তে এসেছি।"

"প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন, আমি ডাক্তার, আপনাদের মত বড় ঘরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা থাকলে দরকার মত স্মরণে পড়্তে পারি। ব্যবসায়ের দায়ে এসেছি আর কি।"

"এ দেশের ডাক্তারেরাও কি ফেরি করে ঘোরে?"

"পশার না জমা পর্য্যন্ত খুরতে হয় বই কি ?"

"তুমি দেখ্ছি খুব বড় ডাক্তার' কোথাকার শিক্ষা ?"

"এমেরিকায়। ডাক্তার খুব বড়, এখনও নাম বেড়িয়ে পড়ে নাই। তোমাকে ত ভাই বেশ রোগাই দেখ্ছি।"

"বটে ? তোমার ত খুব বিদ্যা দেখ্ছি। কিসে বুঝ্লে আমি রোগা ?"

"তোমার চোক্ মুখ দেখে. তোমার ভিতরে নিশ্চয়ই কেনেও রোগ আছে, যান্ত্রিকও হতে পারে মানসিকও হতে পারে।"

"তোমার মনে হয়,—এর কোন্‌টা ?"

"মানসিক রোগ বলেই মনে হয়; বোধ হয় তোমার প্রেমিকের সঙ্গে ভাল মিল থাচ্ছে না ?"

যুবতী এবার হাসিয়া পড়িল, বলিল, "আমার স্বামীর সঙ্গে অভাব ?—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, তিনি আমায় ভাল বাস্‌তে একটুও ক্রটী করেন না ?"

"তবে তুমি তোমার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌ছ না।"

"সে আরও মিথ্যা কথা। আমি প্রাণ দিয়াছি, সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁকে ভাল বেসেছি।"

"তা হ'তে পারে, তবু এর মধ্যে কি একটা দেখাপ বেয়াড়া কিছু আছে। তোমাদের সংসারটা আমি তেমন প্রেমে মাখা মিষ্টি বোধ কর্‌লাম না।"

যুবতী তখন নিজেই কেট্‌লি হইতে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "চা-পান কর ভাই, তুমি বড় হাসির মানুষ।"

আমি চা খাইতে খাইতে বলিলাম, "তুমি ভাই এতকাল বাঙ্গালী স্বামীর সহবাসে নিশ্চয়ই কিছু বাংলা শিখেছ, এসোনা বাংলায় কথা বার্ত্তা বলি।"

যুবতী বলিল, "না আমি বাংলা কিছুই শিখি নাই, স্বামী আমার সঙ্গে বাংলা কথা কখনও বলেন না।"

"ও, তবে কিছুই হয় নাই, ভাষাটুকুও আদান প্রদান হয় নাই, তখন হৃদয় ত অনেক দূর। তুমিই কেবল দিয়েছ, তিনি কিছুই দেন নাই।"

"তাঁর তেমন কিই বা আছে যে দেবেন?"

"আছে বই কি অনেক, দিতে পাচ্ছেন না। আর কারু জন্য তুলে রেখেছেন।"

"আর তাঁর কে আছে? একদিন একটা জানোয়ার এসেছিল, সে নাকি মায়ের ভাই মামা। তাড়িয়ে দিয়েছেন, একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে।"

"টাকা পয়সা খুব জম্‌ছে ত?"

"কই আর জম্‌ছে? কারবারে লোকসান হচ্ছে।"

"শেষে লাল বাতি জ্বাল্‌তে না হয়।"

"না, তেমন কিছু নয়, খুবই ত খাটছেন, এবার কিছু সুবিধা দেখা যাচ্ছে।"

"তবে আসি এখন" বলিয়া উঠিলাম। যুবতীটী নেহাৎ অভদ্র নয়, আমার সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিল। নামিবার সময়ে বলিল, "মাঝে মাঝে এসো দয়া করে।"

আমি বলিলাম, "দয়া করে আমরা আসি না। আমরাও ব্যবসায়ী, লাভ দেখ্‌লে আসি।"

"আপনার ফোন নম্বরটা বলে যান, আমি ডাক্‌বো। আপনার নামটা?"

আমি তখন নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া হো হো করিয়া হাসিলাম। সে হাসিতে শ্বেতাঙ্গ যুবতী নীচে পর্য্যন্ত না আসিয়া পারিল না। এমন হাসি যেন সে অনেক দিন দেখে নাই। অভাগিনী ত জানে না, এমন ভাবে হাসিতে না পারিলে নারী মরিয়া যায়। কেবল দেনা পাওনা লাভ ক্ষতি লইয়াই সংসার পাতিয়াছে, হাসি আনন্দের সে কি জানে? পরম শত্রু যে, সে যদি এমন হাসি আনন্দে বঞ্চিত থাকে, তা দেখিলে আনন্দ না হয় কার? আমি হাসিতে হাসিতেই আমার ফোন নম্বর বলিলাম। সেই সঙ্গে বলিলাম, তোমার স্বামী ডাকিলে কিন্তু আসিব না, আমি পুরুষের ডাকে আসি না। নামটা মিথ্যা বলিলাম, সত্য বলিতে সাহস হইল না।

(৪)

বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, দাদা আসিয়া বসিয়া আছেন। তিনি নাকি আজ আমার মুখখানা খুব হাসিমাখা দেখিতে পাইলেন, আমি সুস্থ স্বচ্ছন্দ আছি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কতদিন আমাকে দেখিতে আসিতে পারেন না বলিয়া ক্রটী স্বীকার করিলেন। আমার আয় উপার্জ্জন কেমন হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বাক্সের চাবিটা খুলিয়া দিয়া বলিলাম, "অনেকগুলি টাকা পেয়েছি দাদা নিয়ে যান।" দাদা বলিলেন, "আমি টাকা নিয়ে কি করবো?"

"কি করবেন তা কি জানি? লোকে যা করে। মেয়ে মানুষে ত কিছু কর্ত্তে পারে না।"

দাদা টাকাগুলি বাহির করিয়া গনিয়া নোট, কাঁচা টাকা পৃথক করিয়া বলিলেন, "এই ত সবে তিন শ বার টাকা,—এই হলো অনেক গুলো!"

"আমিত এখন তিন মাস বসে খেতে পারি।"

"তা বটে, তুমি ব'সে থাক্‌বে, তবে আমি যে তোমায় পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ কর্ত্তে এত টাকা দিয়েছি, তার কি হবে?"

"সে টাকা আপনি দিলেও নেবেন না জানি।"

"না নেবো না। আমি কল্পতরু আর কি? আর তুমিত আমার ভারি বোন্‌, মুখবলা বোন বইত নও।"

আমি খুব হাসি হাসিলাম। তিনি বলিলেন, "কিছু খাবার টাবার দিবি না?"

আমি একটুও অপ্রতিভ হইলাম না, বলিলাম "ঐ ত টাকা আছে, আনিয়ে খান না।"

ঝিকে ডাকিলাম, ঝি সন্দেশ আনিল। ভাই বোনে বসিয়া খাইলাম।

দাদা টাকাগুলি লইয়া উঠিয়া গেলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, "বিজয়! তুমি গিয়ে আমায় যে এমন ভাই দিয়ে গিয়েছ, তাতেই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার নিষ্ঠুরতায়ই ত দাদা আমার প্রতি এত স্নেহশীল।"

তাহার পর ভাবিলাম, বিজয়, কি যন্ত্রণার তুষানলেই তুমি দিন কাটাচ্চ! যাহাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিয়া সংসার পাতাইয়াছ, তাহার সঙ্গে ভাষা-বিনিময়টুকুও করিতে পার নাই। প্রাণের জনের সহিত মাতৃ-

ভাষায় কথা না বলিতে পারার মত দুঃখ কি আর আছে? মার্কিন মুলুকে থাকিবার কালে দিন ভোর ইংরাজী বকুনি বকিয়া জিহ্বার সঙ্গে মনটা কি বিশ্রী হইয়া পড়িত; দাদার সঙ্গে দেখা হইলে তবে দুটো কথা বলিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিতাম। কি কষ্ট! যখন প্রাণ খুলিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া নাচিতে ইচ্ছা হইতেছে, তখন চুপটি করিয়া মুচকি হাসিটী দিয়া আদব বজায় রাখিতে হইবে।—সে আবার অতি প্রিয়জনের সঙ্গে! বিজয়! তুমি আমায় ভুলিতে পার নাই। আমি তোমায় ছাড়িব না। আমার হারাণ মাণিক! অমূল্য রত্ন, হৃদয় সর্ব্বস্ব, হাসির আনন্দ, সুখের আশা, জীবনের সার, আমার ভক্তির দেবতা, শক্তির বিধাতা, সাধনার ঠাকুর, আমি তোমায় ছাড়িব না। তুমি আমার, আর কারু নও।

ফোনে এলার্ম পড়িল, কাণ দিতে হইল। খবর আসিল জরুরি কেশ্ প্রস্তুত হন। কলে যাইতে হইল, দাদা যে তাড়া দিয়া গিয়াছেন, টাকা অবহেলা করা চলিবে না। ঝি আসিয়া বলিল, রান্না খাওয়ার কি হইবে। আজ আর রান্না খাওয়া হয় না, একটা বামন দেখ্।" বলিয়া বাহির হইলাম। সেখানে গিয়া আর একটী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার দেহটী নেহাৎ পাতলা, তাই বেশ লম্বা দেখায়। মুখে কপালে শিরগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুটী কোটরে ঢাকা হইলেও বেশ বড় বড়, চাহনি দেখিলে ভয় হয়। মাথার চুলগুলি খাড়া থাকিতেই চায়, সুতরাং বাধ্য হইয়া বাবু তাহা ছাটিয়া ছোট করিয়াই রাখিয়াছেন। রংটী ফরসা, তবে তাহার উপর চিত্রকর যেন পাতলা একটু তামার পোঁচ দিয়া "টু কলার গ্রাউণ্ডের" মত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গোঁপজোড়া বেশ মোটা, বাবুটী তাহা না ছাটিয়া কাটিয়া বেশ বুদ্ধিমানের পরিচয়ই দিয়াছেন; তাহা না থাকিলে

হয় ত সে দেহে পুরুষের লক্ষণ না থাকিতেও পারে। স্যুট-পরা ডাক্তার-টীর দর্শন আমার নিকট বেশ নূতন বলিয়াই বোধ হইল। নাম শুনিলাম ডাক্তার ভদ্র এম, বি। ডাক্তার আমাকে ডাকিয়া একটা কামরায় নিয়া গিয়া চুপে চুপে একটা কথা বলিলেন, শিহরিয়া উঠিলাম। তবু বলিলাম আচ্ছা রোগী দেখে নি।

রোগীণী গৃহস্থের বিবধা পিতৃব্যপত্নী, ঠিক যুবতী নয়, প্রৌঢ় বয়সের কাছাকাছি। ৩২।৩৫ বৎসর বয়স হইবে। শুনিলাম রোগিণী পুরুষ ডাক্তারের ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক, তাই বাধ্য হইয়া মেয়ে ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছে। গৃহস্থ পুলিশ কোর্টে মোক্তারী করিয়া খুব পশার জমাইয়াছেন, টাকা আছে। আমাকে ডবল ফি ৩২৲ টাকা দিতে চাহিলেন। আমি অন্য লোক ঘর থেকে সরাইয়া দিয়া রোগিণীকে বলিলাম, "আমার ঘরে যাবে দিদি! আমি তোমার সকল ভার নিতে রাজি আছি।" রোগিণী বলিবামাত্রই দ্বিতীয় কথা না বলিয়া সম্মত হইলেন। আমি বলিলাম, তবে চল এখনই। গৃহস্থকে বলিলাম, "আপনার সকল বিপদ আমি ঘাড়ে লইলাম, আমি রোগী বাড়ী নিয়া যাই। তবে আপনার পাপটা বোধ হয় চাইলেও পরকালের নিকাশী মুহুরী আমার ঘাড়ে দেবেন না। এতে আপত্তি করলে, আপনার ইহকালের সর্ব্বনাশও আমি করে দিবো।"

সকলে ত অবাক! যেন বজ্রাহত! আমি কাল বিলম্ব না করিয়া রোগিণীকে গাড়িতে তুলিয়া চলিয়া আসিলাম। ফির জন্য হাত পাতিলাম, টাকা ছাড়িতে পারি না, দাদার তাড়া। গৃহস্থ বাবু কম্পিত হস্তে দু'খানি দশ টাকার নোট আমার হাতে দিলেন। শুনিলাম মোক্তার হইলেও তিনি রায় বাহাদুর! কপালের জোর আছে।

সন্ধ্যা বেলায় বাহিরের ঘরে একটু বসিয়াছি, বড় শ্রান্তি বোধই হইতেছে। সেই যে মস্ত বড় দেহধারী ডাক্তারটী, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই বলিলেন, "রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম একটু বসে যাই।"

আমি বলিলাম, "এত অনুগ্রহ! রোজই এই রাস্তা দিয়ে যান বোধ হয়।"

"হ্যাঁ, রোজই নয়, তবে প্রায়ই।"

"যে দিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইয়েছিল, তার পর থেকে?"

"তা বটে, সেই দিন থেকে এ পথটায় যেন কে টেনে নিয়ে আসে।" বাবু বেশ হাসিলেন।

আমিও ফেরতা হাসি দিয়া বলিলাম, "সার্থক আমার দেহটা, এত বড় পাহাড়ও টান্‌তে পেরেছে।"

"তা সত্যি, তোমাকে দেখ্‌লে বড় আনন্দ হয়।"

"এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, ভদ্র মহিলাকে তুমি না ব'লে, আপনি বলে সম্ভ্রম দেখান সম্ভ্রান্ত লোকের কর্ত্তব্য।"

"আমাদের মধ্যে অতটা তফাৎ না থাকে এইটাই আমার ইচ্ছা।"

দ্বারের কড়া নড়িল, ঝি খুলিয়া দিল। সেই পাতলা ডাক্তার বাবুটী। সাদর সম্ভাষণে বসাইলাম। "আসুন, সুপ্রভাত।"

মিষ্টার ভাদ্র ঘরে ঢুকিয়াই কিছু বিস্মিত হইয়াই বলিলেন, "এই যে, ডক্টর বসাক, সুপ্রভাত।"

আমিও হাসিয়া বলিলাম, "বহবা, বৈশাখে মিলন, ভাদ্র গুড়িগুড়ি ফোটা, আর তপ্ত বালির ফোয়ারা,—বিদ্ঘুটে মেঘলা, আর আগুন ঢালা রোদ, পচা কাদা আর পা-পোড়া পাথর। এ শুভ মিলন সুপ্রভাতেরই লক্ষণ।"

মিষ্টার ভাদ্র হাসিতে গিয়া মুখটা বিশ্রীভাবে ব্যাদিত করিয়া, বলিলেন, আপনি দেখ্‌ছি বেশ সুকবি, আসুন না আমরা মিলে মিসে একটা মাসিক পত্র প্রকাশ করি।"

"তার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় অবশ্য আমারই ছবিখানি ছাপ্‌তে হবে। আমি যখন বাথরূমে দাঁড়িয়ে স্নান করি, অথবা আয়না সুমুখে রেখে চুলে চিরুণী চালাই।"

মিষ্টার বসাক বলিলেন, "রমণীই ত সংসারের রঙ্গিনী, ভুবন-মনো-মোহিনী, পুলক-প্রসাদ-দায়িনী সোহাগিনী, "রমন দায়িনী বলেই ত নাম রমণী।"

"আবার জননী ভগিনীও ত।"

এ কথায় কেহ উত্তর করিল না। আর অধিক ক্ষণ ইহাদের স্থান ও প্রশ্রয় দেওয়া উপযুক্ত বোধ করিলাম না। মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিয়া পরুষ কণ্ঠেই কহিলাম, "আপনারা দেশের কোনও যুবতীকে ঘোমটা খুলে পথ চল্‌তে দেখ্‌লেই বুঝি, মনের মধ্যে নরক রচনা করে বসেন। এই নারীর বুকে মায়ের স্বর্গসুধা লুকান, তা বুঝি মনেই আসে না।"

বাবু দু'টী থতমত খাইয়া তাঁহাদের বিশ্রী মূর্ত্তি আরও বিশ্রী করিয়া ফেলিলেন। উঠিয়া পলাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, টেবলের উপর হইতে হাত নড়িল, কিন্তু পা নাড়িতে যেন ভয় করিতেছিল। আমি বলিলাম, "এক্ষণে নির্ভয়ে প্রস্থান করুন।"

মোটাটী উঠিলেন, পাতলাটী তবু বসিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি আর কি চান?"

তিনি তবুও চুপে চুপে বলিলেন, "লোক্‌টা নেহাৎ ছোট লোক।"

হাসি পাইল, বলিলাম, "তবু আপনার চেয়ে ওজনে চারগুণ ভারি।"

কয়েক দিন পরে কল্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দাদা বসিয়া আছেন। তিনি বাড়ীর ভিতর আর একটা স্ত্রীলোক দেখিয়া বাহিরেই বসিয়া আছেন। আমি বলিলাম, "বাহিরে কেন, চলুন উপরে যাই।" দাদা বলিলেন, আর একজন স্ত্রীলোক দেখ্‌লাম যে।"

"বামুনী রেখেছি, আজ খেয়ে যেতে হবে দাদা।"

"তোমার ঐ বামুনীর হাতে? আমা হতে ত হবে না।"

উপরে গিয়া দাদাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম; তাঁহাকে ত কিছু গোপন করিতে পারি না। বলিতে খুব লজ্জা বোধ হইতেছিল, তবু না বলিয়া পারিলাম না। বড় ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "দোষ করেছি কি দাদা?"

দাদা ভাবিয়া বলিলেন, "দোষ কিছু নয় তবে বিপদ আপদ না ঘটে।"

তার পর তিনি বলিলেন, তাহার একটী বন্ধু পত্নীর বড় পীড়া, তিনি একটী মফস্বলের মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট। আমাকে তাহার স্ত্রীকে দেখিতে আজই যাইতে হইবে। তিনিও সঙ্গে যাইবেন। দুদিন ছুটি আছে, পরে তাঁহার সময় হইবে না।

দাদার সঙ্গে যাইতে হইল। তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারি না। গাড়ি ষ্টিমার চড়িয়া একটা দিন কাটাইতে হইল। পল্লী বক্ষে রজত হারের মত ক্ষুদ্র নদীটী ছোট ছোট তরঙ্গমালা নাচাইয়া শান্ত স্রোত বহিয়া যাইতেছে; দুইধারে কোথাও গৃহস্থের সাজান বাগানের

আম জাম নারিকেল কদলীর গাছগুলি নদী বক্ষে ঝুঁকিয়া তাহাকে ছায়া ঢাকা করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও পতিত ভূমির জঙ্গলে তীরভূমি দুর্গম অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। কোথাও গৃহস্থের কুটীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে, মাঝে মাঝে সম্পন্ন গৃহীর অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। ঘাটে ঘাটে পল্লী নরনারী স্নান করিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, মেয়েরা কলসী কক্ষে ঘোমটা খাটো করিয়া আমাদের ষ্টিমার দেখিতেছে; বালক বালিকারা ষ্টিমারে আহত তীরে আছড়াইয়া পড়া ঢেউগুলির উপর লাফালাফি খেলিতেছে। মাঝে মাঝে বসতি নাই, বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত; ধান নাই, কাটিয়া নিয়া গিয়াছে; সে মাঘ মাসের শেষ। স্থানে স্থানে কৃষকেরা পাতার ছাউনি দড়মার ঘেরা কুটীরের প্রাঙ্গনে ধান নাড়িতেছে। এক একটা স্থানে শ্মশানের কলসীর কাছে বাঁশ পোতা, অনেকগুলি, মড়ার খাটিয়া বিছানা ছড়ান। মরার কথা মনে পড়িলেই জীবিতের আতঙ্ক আসে। দাদাকে বলিলাম, "ওঃ! কত লোকই মরেছে!" দাদা হাসিয়া বলিলেন, মিস বাসু ডাক্তার থাক্‌লে এত মরে! দাদা বড় দুষ্ট, ঘা দিবার অবসর পাইলে মোটেই ছাড়েন না। দাদা একবার গম্ভীর হইয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছ মাধবী, এই পল্লীমাটী হইতেই রসরক্ত গিয়ে সহরের সে সৌধ-সাগর গড়া হয়েছে।"

দাদার বন্ধু বাড়ীতে মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হইলাম।

তিনি সেখানকার রাজা, আমরা সেই রাজার অতিথি, কত অনুচর তাবেদার আসিয়া সেলাম নমস্কার করিল। রোগিণী দেখিলাম। মূল্যবান পরিচ্ছদালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তিনি তাঁহার বিশ্রী সুন্দর দেহখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, ভিতরে বিষের প্রবাহ বহিতেছে। পরীক্ষা করিলাম, তরুণীর ক্ষীণ অঙ্গে ইনজেক্‌সনের সূচির আর স্থান নাই। রোগের নাম কতই বা করিব। রাগ যা হইল, এত রাগ বোধ হয়

জীবনে কোনও দিন মাথায় ওঠে নাই। ক্রোধবশে বেহুস হইয়াই বলিলাম, এ রোগের আবার চিকিৎসা কি? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর, এক কোপে মানুষ কাটলে ত তাঁর আইনে ফাঁসি হয়, বিষের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধে মানুষ মারলে তার শাস্তি আইনে কি লিখে?"

দাদা ধমক দিলেন। তাহার ধমকে একটু হুসিয়ার হইয়া বলিলাম, "শুধু স্ত্রীর চিকিৎসা করিলে চলিবে না, স্বামীরও চিকিৎসা করিতে হইবে।"

অনুসন্ধানে জানিলাম, এ বিষ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলাত হইতে লইয়া আসিয়াছেন!" রোগিণীকে বলিলাম, "দিদি, তোমার বাপের বাড়ী আছে ত?" জানিলাম তাঁহার বাপ ভাইও বড় লোক। ব্যবস্থা দিলাম অন্ততঃ, গোটা দুই বৎসর তাহাকে পিত্রালয়ে থাকিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। দাম্পত্য প্রণয়টা এই দুই বৎসর একেবারেই ডুবাইয়া রাখিতে হইবে।

সেই ছোট সহর হইতে, অনেক রোগী জুটিল। এক দিন, রাত্রি দেখিলাম, তবু ফুরাইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে একটী ষোল সতের বৎসরের বালিকা দেখিলাম। বালিকাটীর বেশ নধর মাংসল দেহ, রংটী একটু ময়লা; কিন্তু শরীরের বিশুদ্ধ রক্তের জ্যোতি তাহার কিশোর কলেবরটী বড়ই উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে! বেশ বড় দুটী চক্ষু লজ্জার সঙ্গে করুণা মাখা। আমারই সেবায় সে নিযুক্ত, তাহাতেই অনন্তকর্ম্মা হইয়া খাটিতেছিল। আমি বালিকাটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কেবল নামটী বলিল, "দুলালী," দুলী তাহার খাটি নাম নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট্ গৃহিণীর কাছে শুনিলাম, বালিকাটী তাহার মামার দেশের এক গরীব ভদ্র লোকের মেয়ে। ভদ্র লোকটী একটী

কলেজের ছাত্রকে যথাসাধ্য দান সামগ্রী দিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বরের পিতা সঘরের কন্যা পাইয়া কুল রক্ষা করিয়াছিলেন। বরের কিন্তু কালো বলে বউ মোটেই পছন্দ হইল না, সেই সঙ্গে দান সামগ্রী ঘড়ি আংটি বিছানা বালিস কিছুই পছন্দ হয় নাই। তিনি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এ স্ত্রী তাঁহার পরিত্যাজ্য। আবার বিবাহ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। জানিলাম এখনও করেন নাই। পল্লীগ্রামে আর বিবাহ করিবেন না, সহরে চেষ্টায় আছেন। ইহাও শুনিলাম, সহরে তিনি এখনও কাজ কর্ম্ম কিছু পান নাই, বি, এ পাশ করিয়া উমেদারী করিতেছেন।

দুলালীর পিতা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন, মাতা দুটী শিশুপুত্র নিয়া কষ্টে আছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গৃহিণী মামার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, দুলালীর প্রতি দয়া পরবশ হইয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, মেয়েটীকে আমাকে দাও, আমি ওর স্বামী ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিব। সে গাধাটা নিশ্চয়ই আজ কাল ওকে দেখে নাই, সেই যা বার বছরে খুকিটী দেখিয়াছিল। এ মেয়ে যদি কুরূপ বলিয়া উপেক্ষিত হয়, সে ত নারী জাতির বড় অবজ্ঞা।

দুলালী ত শুনিবামাত্র যাইতে চাহিল, তাহার স্বামী পাইবার বাসনা বড়ই প্রবল দেখিলাম। তাহার রক্ষয়িত্রীও অস্বীকৃত হইলেন না। দাদাকে বলিলাম "মেয়েটীকে আমার নিতেই হইবে।" আমি যাহা সত্যি করিয়া মন দিয়া আবদার করি দাদা তাহা অগ্রাহ্য করেন না। সম্মতি দিলেন।

পর দিন বলিলাম, একটু পল্লী-গ্রাম দেখিতে ইচ্ছা করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নৌকা লোক যোগাড় করিয়া দিলেন। দাদার সঙ্গে পল্লী গ্রামে যাত্রা করিলাম। ছোট বজরা, ছোট স্থতি খাল, সে ভারি আনন্দ!

একটা কৃষক—গ্রামের মধ্যে নামিয়া হাটিয়া চলিলাম। কত গরু কত গোলা মড়াই দেখিলাম। একটী বাড়ীতে ডাব কিনিয়া খাইতে চাহিলাম, তাহারা পয়সা লইল না, ডাব পাড়িয়া বাতাসা আনিয়া দিল, আমি ডাবের জলও খাইলাম, বাতাসা দিয়া ডাবের নেওয়াও খাইলাম, বড় মধুর লাগিল। বলিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের লোক তাড়িয়ে দাও, তার ভয়ে পল্লীবাসী ফলের দাম নেয় না।

ভাই বোন মাত্র চলিলাম। কৃষক পল্লী ছাড়িয়া ভদ্র পল্লীতে ঢুকিলাম! গ্রামটীর নাম শুনিলাম চাঁপাতলা। নামটী শুনিবামাত্রই মনটা কেমন দমিয়া গেল। এ কোন্ চাঁপাতলা, বিজয়ের গ্রামের নাম শুনিয়াছিলাম চাঁপাতলা! আর ত কিছু জিজ্ঞাসিতে পারিলাম না; দাদা সঙ্গে। তবু দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া বাধ বাধ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "এ গ্রামে কোনও সিংহবাড়ী আছে?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিলেন, "সিংহ বাড়ী ছিল, এখন সে ভিট্টা ছাড়া রয়েছে; সে বংশে একটী ছেলে আছে, কলিকাতায় কারবার করে খুব বড় লোক হয়েছে, দেশে আর আসে না। জঙ্গলের ভিতর ভাঙ্গা ঘরটী পড়ে আছে মাত্র।"

দাদাকে বলিলাম, "চল না দাদা সেই বাড়ীটা একটু দেখে যাই।" দাদা একটু হাসিলেন, আবার বিলক্ষণ বিমর্ষ মুখেই বলিলেন, "তা দেখে যেতে হবে বই কি? বিধাতা যে কাকে কোথায় এনে ফেলেন!" সেই লোকটীকে বলিলেন, "সে বংশের যে কুলাঙ্গার বড় হয়ে জন্মমাটী ভুলেছে, তার নামটী মশাই?"

ভদ্র লোক বলিলেন, "নাম তার বিজয়, যে বিয়ে করে জাত খুইয়ে বসেছে।"

সেই বাড়ীতে গেলাম! চারিদিকেই জঙ্গল। কয়টী পোতায় ঢিপে বিবিধ গুল্ম জড়াইয়া বিছুটী ছাইয়া রহিয়াছে। ছোট একটী কোঠাঘর, বহুকালের পুরাতন, অসংস্কৃত; জানালা দরজাগুলি খসিয়া গিয়াছে। একটা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, এক রাশি আবর্জ্জনা ইঁদুর আরশোলার পুরীষে পরিপূর্ণ। দুর্গন্ধে দাঁড়াইতে পারিলাম না। বাহিরে চাহিয়া দেখি, কয়টা আম গাছে বোল ধরিয়াছে। একটার বোল ভরা ডাল ছাদে আসিয়া পড়িয়াছে; ছাদে বসিয়া আমগুলি পাড়িতে কুড়াইতে কি আনন্দ! একটা গাছে পাতায় পাতায় টোপা কুল পাকিয়া রহিয়াছে। কলকগুলি আঁচলে ভরিলাম! পিছনে ফিরিয়া দেখি, দাদা দাঁড়াইয়া নিশ্চল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত তাহার মুখ খানা বিশ্রী গম্ভীর। চোক দিয়া যেন জল ছোটে। তখন সংজ্ঞা হইল. আহা! দাদাকে ত বড় ব্যথা দিয়াছি। কি পাগলামি করিতেছি! আঁচলের কুলগুলি ঝাড়িয়া ফেলিলাম। গ্রামের কয়েকজন মেয়ে পুরুষও সেখানে আসিয়া জমিয়াছিল, তাহারাও আমার এই অস্বাভাবিক চঞ্চলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আমি স্থির হইয়া দাদার কাছে দাঁড়াইলে, একজন বৃদ্ধা বলিলেন, "তুমি কাদের মেয়ে মা?"

আমি বলিলাম, "বসুদের।"

"কোন ঘরের বউ?"

দাদাই উত্তর করিলেন, "শ্বশুরের ঘর ও এখন করে নাই, স্বামী নিরুদ্দেশ।"

একজন পুরুষ লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীটা দেখবার এত ইচ্ছা কেন?"

দাদা বলিলেন, "ওর ইচ্ছা এ বাড়ীটা কিনে নিয়ে এখানে এসে বাস করবে। "দাদার বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া আমি প্রশংসা করিলাম। আমি যদি উত্তর দিতে পারিতাম, তবে এই উত্তরটাই দিতাম।

আর একবার বাড়ীটার এদিক ওদিক চাহিয়া বিদায় লইলাম। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যত্ন করিয়া বাড়ী লইতে চাইল! দাদা বলিলেন "আর সময় হইবে না। আমরা সহরে থাকি, পল্লী গ্রামটা দেখিতে আসিয়াছি।'

(৬)

হা—ভগবান! আমার না কি কাজ ছিল না। কোনও কাজ জড়াইব না সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এখন দেখি কাজ করিয়া অবকাশ পাই না। সেই যে মোক্তারের বাড়ী হইতে একটা বিধবা কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম, সে একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। ফুট ফুটে ফুলের মত মেয়েটী তাকে একটু কোলে কাখে না করিয়া পারি না; মা'টা তার কেবল কাঁদে আর ভাবিয়া শুকাইয়া যাইতেছে। এদিকে দিনে দু'তিন বার কলে ছুটিতে হয়, দাদার তাড়া টাকার দরকার।

আবার দুলালীকে আনিয়াছি, তাহার স্বামী ধরিয়া দিতে হইবে। ছ'সাত মাস হইতে যায় তারত চেষ্টাই করিলাম না। তাহার স্বামীর ঠিকানাটা জানিয়া আসিয়াছিলাম, একদিন গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি,

লোকটা হাল চলনের বাবুই বটে। টিউশনি মাত্র সম্বল, আশানুরূপ চলনের সুসার নাই।

একটা দুষ্টবুদ্ধি আসিল। খানকয়েক কাগজে লিখিলাম; বি, এ, পাশ গৃহ শিক্ষক চাই, সন্ধ্যার পর একটী ছাত্রী পড়াইতে,—মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা। তাহা সহরের গোটাকতক লাইট পোষ্টে লাগাইয়া দিলাম। পর দিন পিওন আসিয়া এক গাদা খামের চিঠি দিয়া গেল কি জ্বালা! এত চিঠি আমি পড়ি কখন? দুলালী মেয়েটাত কোনও কাজেরই নয়, ইংরাজী মোটেই জানে না, যে চিঠি গুলির নাম অন্ততঃ পড়িয়া দিবে। অনুগত ভৃত্যদিগের নামগুলি মাত্র পড়িয়া লইলাম। পর দিন তাহার চেয়ে ডবল চিঠির গাদা। এখন যে আর একটা বিজ্ঞাপন দিতে হয়:—আমার চিঠি পড়িবার জন্য একজন লোক চাই। কলে যাইবার সময়ে গাড়ীতে যাইতে যাইতে পড়ি। পরদিন আরও চিঠি! একখানা চিঠি পড়িয়া দুলালীকে ডাকিয়া বলিলাম, দেখ্ দেখি এই তোর মনোহর না কি? দুলালী লজ্জায় মুখ ফিরাইল। আমি চিঠি লিখিয়া দিলাম, অপরাহ্ণ ৪টায় দেখা করিবেন।

পরদিন দুপুর হইতেই টিপটিপে বৃষ্টি। নীচে নামিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। উপরে থাকিয়া খুকী শকুন্তলাকে আদর চুম্বনে হাসাইয়া কাঁদাইয়া আনন্দ করিতেছিলাম। চারিটা বুঝি তখন বাজে নাই। দ্বারে কড়া নড়িল। দুলালীকে বলিলাম, "দেখ্‌ত কে এলো?" দুলালী বলিল সে পারিবে না। ঝাঁ করিয়া কথাটা মনে পড়িল। আজত দুলালীর মনোহর আসিবার কথা! আমি ভুলিয়া গেলে কি হয়। দুলালী সারাদিন ঘড়ির কাঁটার দিক নিশ্চয়ই চাহিয়াছিল। হায়রে মূঢ় বালিকা! এমনটা কি শুধু তুই একা করিস্? আমিও যে একটা ঘড়ির কাটার পানে তাকাইয়া একটা বছর কাটাইয়া দিলাম।

তোর ঘড়ির কাটা বার ঘণ্টায় ঘুরিয়া আইসে, বার বছরেও কাঁটা কি আমার ঘুরিবে। আজকার বাদলাদিনের মত মনটা ভার করিয়াই নীচে নামিতে হইল। ইহার আগেই ঝি দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। বাবুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া বলিলাম, "যে বাদলা দিন, এমন দিনেও মানুষ ঘরের বার হয়?"

যুবকটী নেহাৎ বোকা ব্যাকুব ভাল মানুষটি নন। কথার উত্তর করিলেন, "দেখা যেত, এখন যদি রোগী বাড়ী থেকে একটা ডাক আস্‌তো।"

উপযুক্ত উত্তরটি পাইয়া খুসী হইলাম। বলিলাম "আপনি কি মনে করেন, টাকার কাছে মানুষের সুখ সুবিধার আরাম বিরামের কোনও মূল্যই নাই?।

"মানুষের সুখ সুবিধা ঐ টাকার উপরই নির্ভর করে।"

"যাক, আপনি মনোহর বাবু?"

যুবক আমার জবাবী চিঠি খানা বাহির করিয়া দেখাইল। আমি বলিলাম, "একটু অপেক্ষা করুন আমি আস্‌ছি।" উপরে গিয়া দুলালীকে জিজ্ঞাসিয়া আসিলাম, কেমন এইত, দেখে যা। দুলালী উপর থেকেই আমার আগেই দেখিয়া লইয়াছে, আজ সে জানালার কাছেই বসিয়াছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, "কাল থেকে আপনি সন্ধ্যা সাতটায় আসিবেন, ৯টা পর্য্যন্ত আপনার থাকিতে হবে, আমার একটী বোনকে পড়াতে হবে, বোনটী একটু হাবা গোছের নামও হাবী। জামাই বাবুটী খুব লেখা পড়া জানেন। এমন হাবা মেয়ে নিয়ে ঘর কর্ত্তে চান না। আমার ঘাড়েই চেপে আছে। এ বোঝা আর কত দিন বই?" একটু লেখা পড়া না শিখিয়ে পাচ্ছি না। অক্ষর পরিচয় চিঠি খানা পত্র খানা লিখ্‌বার মত বিদ্যা তার আছে।

আর একটু বিদ্যা তাকে দিতে হবে, তুই একখানা নভেল নাটক পড়্‌তে পারে, ইংরাজী চিঠির বার নামগুলি পড়তে পারে, বা লিখ্‌তে পারে। ত্রিশটী করে টাকা আমি দেবো।”

মনোহর অভিবাদন করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন। আমি বলিলাম, “বোস, ব্যস্ত কি? তোমার ছাত্রীটীকে একবার দেখে যাও। দিন ভাল টাল আমরা মানি না। শুভ দিন শুভক্ষণে, বিশুদ্ধ বেদ মন্ত্র পড়ে, শালগ্রামের সম্মুখে হাত বাধাবাধি দেখেছি, তাত কত খুলে যায়। ওরে হাবী, এই তোর মাষ্টার এসেছে, দেখ্‌বি আয়, এক কাপ চা আর কিছু খাবার থাকেত নিয়ে আয়।”

পোড়া মেয়েটা ভারি দেরী করিতে লাগিল। মনোহরের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলাম। “আর কি কাজ কর্ম্ম করা হয়?” “বি, এল ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছি, আর কি করি।„

“ও একটা সুবিধা বটে, সরকারের লাইসেন্স নিয়ে জাল জুয়াচুরি শেখা যায়। ও হাবী! এলি না, একবারে মরেছিস।”

হাবী আসিল, চায়ের কাপ ও খাবার ডিস্ হাতে। ছুড়ীটা কাঁপছে। আমি বলিলাম, “দেখ দেখি ভাই, এ হাবীটা কি কখনও মানুষ হবে? আমি ওর একটা ভাল নামই বেছে রাখ্‌তে পাচ্ছিনা, হাবী নাম শুন্‌লে কে আর ওকে নিতে আস্‌বে? নামেইত গুণ জাহির হয়ে পড়্‌বে। নামটা কি রাখা যায়, তোমার ঠাউরে দিতে হবে।”

মনোহর হাবীর দিকে নিঃসঙ্কোচেই চাহিল। বুঝিলাম, ভাবনার কিছু নয়, চিনিতে পারে নাই। সে চায়ের বাটী হাতে লইয়া বলিল, “এর নাম রাখুন লবঙ্গলতা।”

"বেশ, ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে। তুমি জয়দেব খানা সন্ত পড়ে এসেছ বুঝি।"

মনোহর সে দিন চা বিস্কুট খাইয়া উঠিয়া গেল। হাবী বলিল "আমি পড়তে পারবো না।" তাহার চোখে দেখি জল। বুঝিলাম! প্রাণে একটু ব্যথা লাগে বই কি। বলিলাম, ক'দিন আর পড়্‌বি? এখন যত সত্বর পড়াতে পারিস, তোর উপর ক্ষমতার নির্ভর। ঐ মোটা চোকে অমন হাবা চাউনি চাবিত, মার খাবি। কেমন নামটা রেখেছে হাবি?"

হাবীর পড়া আরম্ভ হইল। কয়েক দিন পরে দেখি রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, তবু হাবী পড়ার ঘর হইতে আসে নাই। ডাকিলাম, সেইখান থেকেই বলিল, "মাষ্টার মশাই এখনও যান নাই।"

এক দিন দেখি হাবী পড়ার ঘর হইতে আসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। "কি হয়েছেরে? মাষ্টার মেরেছে না কি?" হাবী তবু কাঁদে। আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলাম। মুখ চুম্বন করিয়া বলিলাম, কি হয়েছে বলত দিদি। হাবী ফুলিয়া ফুলিয়া বলিল "আমি না হয় জানি, তিনিত জানেন আমি পরস্ত্রী। দেবতার এমন দুর্ম্মতি কেমন করে সহ্য করি বলো।"

"দূর লক্ষ্মীছাড়ি, ইংরাজী-পড়া বাঙ্গালীর ছেলে কি কখনও দেবতা থাকে? দেবতা তাদের করে নিতে হয়? আজ মাষ্টারকে জল খাবার দিয়েছিস?"

"দিলে কি হয়? তার অর্দ্ধেক আমাকে খেতে হয়। এত মিথ্যাচার কেমন করে আর করি দিদি? এতেও কি নারীর সতীত্ব থাকে?"

হায়রে বোকা মেয়ে! তবুও তুই মন্ত্র পড়া স্বামী নিয়ে খেলা কচ্ছিস্। আমি কি করি তাত জানিস না। আমি যে এই পাঁচটা বৎসর ছায়ার পিছে ছুটে বেড়াচ্ছি! আমার মাথার মণি হারিয়ে গেছে কোন্ অন্ধকার অঙ্গার কূপে। কত গভীরতা সে কূপের? আমি তবু সেই অঙ্গার খুড়েই দিন কাটাচ্ছি। ঐ যে সপ্তাহে তিন চার বার মিসেস সিংএর ফোন্ পেয়ে ছুটে যাই, স্বচক্ষে দেখে আসি আমার অমূল্যনিধির নরকতুর্গতি! তবুও আশা ছাড়্তে পারি নাই। কোনও অপরাধ নাই তার? জানি তিনি আমার! এত বড় বীর ভীমসেন, তিনিও রাক্ষসী মায়ায় ডুবিয়াছিলেন?

গোটা তিনেক মাস কাটিয়া গেল! হাবীর মুখ পানে চাহিয়া বলিলাম, "হারে চুলোমুখী, ডাক্তারের সমুখে থেকেও এত লুকো চুরি, এখনও বল্তে নেই?"

হাবী আমার বুকে পড়িয়া কাঁদিয়া আমার কাপড় ভিজাইয়া দিল। আমি বলিলাম নচ্ছরটাকে কিছু বলিস না কিন্তু, পালাবে।"

শকুন্তলার মাও ব্যাপারটা বুঝিয়াছে। সে এক দিন বলিল, কি কর দিদি? মাষ্টারটা তাড়াও।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাড়াব যদি তবে এনেছি কেন? এখন তাড়িয়েই বা কি লাভ?"

"তোমার কি খেলাই এই?"

"হ্যাঁ, এই খেলাই খেলে দেখ্‌বো, দেখি এর সীমা কত দূর।"

শকুন্তলার মায়ের যাহা দেহ মন, তাহাতে অধিক কথা বলা তাহার শক্তিতে কুলায় না। এখন আর সে রান্না করিতেও পারে না। নিজের দুটী হবিষ্য নিজে রেঁধে খায়, আর মেয়েটা কোলে করে বসে কাঁদে। আর মাঝে মাঝে শিহরে উঠে! তার মনের ভাব আমি বুঝি; শকুন্তলার সুন্দর মুখের হাসিরাশি দেখে, যখন তাহার

মনে উঠে, একে কেমন করে মেরে ফেল্তে যাচ্ছিল, তখনই বুক ভেঙ্গে সেই শিহরনটা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝাকা দিয়া উঠে।

যথা কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। দাদার সঙ্গে পরামর্শ লইলাম। এতবড় গুরুতর ব্যাপার তাহার কাছে কি গোপন করিতে আছে ?

নির্দ্দিষ্ট দিনে, মনোহরকে উপরে ডাকিয়া লইলাম। তাহাকে বসাইয়া নিজে দ্বারের গোড়ে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "হারে মনোহর এত বড় নচ্ছার তুমি ? এ সর্ব্বনাশের করি কি বল।"

নিতান্ত ব্যাকুবের মত চাহিয়া লোকটা বলিল, "কি বল্ছেন আপনি ?"

"কি বল্ছি হতভাগা ! বলি হাবী যে পোয়াতী।"

লোকটা এত বড় মরদ, একবারেই কাঁপিয়া গেল। বুঝিবা আসন থেকে পড়িয়া যায়। বড় হাসি পাইল। স্ত্রীলোকের হাসি সময়ে বড় চাপিয়া রাখিতে হয়। ধমক আরও চড়া করিয়া বলিতে হইল, "তোমায় এতে কিছু বল্বার আছে নাকি ?"

মনোহর তবু কথাটী বলিতে পারিল না, নত মুখ আরও নত করিয়া বসিল। আমি আরও রুক্ষ হইয়া বলিলাম, "এখন বোকা বিশ করম হয়ে থাক্লে চল্বে না, বলি মেয়েটা এখন কোন্ কুলে যাবে ?"

হাজার হউক, পুরুষ মানুষ, কত সইতে আর পারে ? এবার মুখ তুলিয়া বলিল, "এমন হাবা সমত্ত মেয়ে একটা যুবকের কাছে অবাধে ছেড়ে দিয়ে আপনাদেরও এমন নিশ্চিন্ত থাকা ভাল হয় নি।"

আমি এবার হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম "ভাঙ্গা বেড়ার ক্ষেত দেখ্লে আর সামলিয়ে থাক্তে পার না। চাষা এসে সিংএ দড়ি দিতে পারে, সে ভয়টা আর হলো না। বেশ আমি ওর মা ভাইকে খবর

দিয়েছি, আস্‌ছে তারা, এসে পুলিশে দিক, আর আদালত করুক, যা হয় করবে।”

মনোহর উঠিয়া যাইতে চাহিল, দ্বারে দাড়াইয়া আমি বলিলাম “কোথা যাবে ভাই? ওর মা ভাই আস্‌ছে, আমি হাতে হাতে ধরে দেব, তার পর যা হয় হবে। তারা আস্‌ছে, এই আটটার গাড়িতে, আটটাত বেজে গিয়েছে।” মনোহর ছুটিয়া আসিয়া পায়ের উপর পড়িতেছিল। আমি ধরিয়া তুলিলাম, “আমার পা ধরলে হবে কি ভাই, সর্ব্বনাশ করেছ ঐ হাবীর, তার পা ধরে দেখতে পার।”

আমার মিষ্ট কথায় একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনোহর বলিল, “ওর স্বামী ত ওকে ত্যাগ করেছে শুন্‌লাম, আমি ওরে চিরতরে গ্রহণ কর্ত্তে রাজি আছি।”

“তবে আমার পা ছুয়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল?”

দাদা শিড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাকিয়া বলিলেন, “এইত তোমার হাবী না দুলালীর মা ভাই এসেছেন মাধবী! এখন যা হয় কর।”

মনোহর এবারে পাঁচ কদম সরিয়া দাঁড়াইল। দ্বার খুলিয়া দিলাম। দুলালীর মা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মনোহর আরও সরিয়া গিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি কোটের বোতামটা খুলিয়া দিলাম। বলিলাম জামাইকে হাওয়া কর মা, সাধের কাপড় এনেছত?”

দুলালীত কুল পাইল, আমার অকুল সাগরে ভাসন ভেলা কি কূল পাইবে? এক দিন গিয়া শুনিয়া আসিলাম, মিসেস সিং বর্ম্মায় চলিয়া গিয়াছেন। সেই দিন হইতে দেখিতেছি, বিজয়ের দেহটা যেন একটু ভাল ভাব ধরিয়াছে। দূরে দাড়াইয়া লুকাইয়া দেখি, কোনও দিন তাঁহার গাড়ির পেছনে গাড়ি হাকাইয়া যাই।

ইহার মধ্যে আর এক বিপদে পড়িলাম। শকুন্তলার মা'টা বাঁচিল না। অভাগিনী হিন্দু রমণী সেই হইতে শুকাইয়া শুকাইয়া গঙ্গা যাত্রা করিল। এর মধ্যে আবার দাদার বিবাহ, মার কান্না কাটিতে আর আমার ধমক মুখ ভারে দাদা বিবাহ না করিয়া পারিলেন না। শকুন্তলাকে কোলে লইয়া দাদার বিবাহে যাইতে হইল। মেয়েটার কথা যে কত জনে কত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তা আর কি বলিব। এক পোড়ারমুখী বলিল, শকুন্তলার মুখখানা সতীশ বাবুর মুখের মতন দেখায়। অধম নারী জীবনে এতও সহিতে হয়! ভাগ্যি দাদা কথাটা শুনেন নাই!

এক দিবস দাদা আসিয়া বলিলেন, "বিজয় বড় পীড়িত, সে ফিরিঙ্গিটা মেয়েটা কাছে নাই, শুশ্রূষার ক্রুটী হচ্ছে!"

আমার হৃদ্‌কম্প উঠিল! বলিলাম, "আপনি এতকাল তাঁর খবর রাখেন?"

রাখি না। সেও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। তোমার খবর নেয়, কেমন আছ। অনেক বলাবলিতে তোমার ঠিকিনাটাও তাকে বলে দিতে হইয়েছিল।"

হায়! এখন কি করা যায়? নির্ব্বাসিতা সীতা যে বিদ্যাবলে ছায়া-রূপিণী হইয়া তাঁহার দয়িতের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন, এ যুগের লোকের কি সে বিদ্যায় অধিকার নাই? একবার সীতাদেবীর মত ভাবিলাম, যাহা হয় হউক, যাই তাঁহার কাছে! কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার আরাম হইবে বিশ্বাস কি? বরং অনিষ্টই হইতে পারে। দাদা নিজেই বলিলেন, "ভয় নাই, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করেছি, দুই জন ভাল শুশ্রূষাকারিণী রাখিয়া আসিয়াছি। ডাক্তারে বলিয়াছেন, যদিও হৃদযন্ত্রের পীড়া, তবু রোগীর মানসিক বল অসীম, শীঘ্রই আরাম হইবে। টাকার টানাটানি ছিল, দিয়া এসেছি।"

দাদা ত বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার ত ভাবনার পাড়ি নাই। সধবা ত কোনও দিন হইলাম না, তবু বৈধব্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। হে অন্তর্য্যামী, তুমি ত দেখিতেছ সকল; এ নারীর হৃদয়ে এতটুকু পাপ কোথাও আছে? সতীধর্ম্ম আমি কি রক্ষা করিতে পারি নাই। তাঁহার টাকার টানাটানি। ব্যাঙ্কের বই খানা খুলিয়া দেখিলাম। এতকাল কখনও দেখি নাই, দাদা আনেন, দাদা রাখেন। বাক্সে টাকা পাইলেই লইয়া যান। আজ খুলিয়া দেখিলাম চারি বৎসরে তাহাতে দেখি পঞ্চাশ হাজারের উপরে জমা রহিয়াছে। আমার এত টাকা, তাহার এই রোগের সময়েও টাকার টানাটানি! কিন্তু আমি কি করি! এত করিয়াও ত নারীত্বের দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারিতেছি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, পুরুষ সাজিব। পুরুষ ত সাজিব, মাথায় এই এক রাশ চুল যে! চুল ত কাটিতে পারিব না! পোড়া চিনাগুলি এখন আবার বেণী কাটিয়া ফেলিয়াছে,—নইলে বেণী পাকাইয়া চিনা সাজিতে পারিতাম। দাড়ি থাকিলে পাগড়ি জড়াইয়া পাঞ্জাবী মুসলমান সাজিতাম, দূর হোক ছাই, পুরুষ সাজা হইবে না।

দায়ে পড়িলে বুদ্ধি আসে। বিজয়ের দোকানের ঠিকানায় ফোন্ করিলাম। বলিলাম, আমার পঁচিশ টন সেগুন কাঠের প্রয়োজন, দিতে পারিবেন কি? কণ্ট্রাক্ট ঠিক হইলে অগ্রিম কিছু টাকাও দিতে পারি। কোটেশন সহ লোক পাঠাইবেন। কোটেশন লইয়া আসিল। বলিল, যদি সিকি টাকা অগ্রিম দিয়া অর্ডার দেন, এক মাসের মধ্যে মাল দিতে পারি। আমি রাজি হইলাম; আমি তখন কিন্তু খাঁটি মেম সাজিয়া বসিয়াছি, এতকাল আমেরিকায় থাকিয়া মার্কিন আদব কায়দা যাহা শিখিয়াছিলাম, তেমনি ভাবে মার্কিন লেডি সাজিয়া দুর্গানাম করিয়া বাহির হইলাম। সিং সাহেবের বাড়ীতে উঠিয়া মার্কিন কায়দায় নমস্কারটী করিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব তখন বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে শুইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমি বলিলাম, আমি আপনার কণ্ট্রাক্টে রাজি হয়েছি, রসিদ দিয়া টাকা নিন; সেক্রেটারীকে বলুন, অর্ডার লিখে নিতে। দু'হাজার টাকার নোট সম্মুখে ধরিলাম।

"হ্যাঁ, না, উত্তম," ভিন্ন বড় কথা তিনি একটুও বলিলেন না। কর্ম্মচারী রসিদ লিখিয়া আনিয়া, সহি করিয়া দিলেন। আমি নামিয়া আসিতে তিনিও নামিয়া আসিলেন। গেট পর্য্যন্ত আসিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও মাধবী।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আমার ঢাকাঢাকি সাজাসাজি সকলই বৃথা হইল, তিনি যেন টলিয়া পড়িয়া যান। আমিও বুঝি পড়ি পড়ি! তবু আমার ডাক্তারি বিদ্যাটা ভুলিয়া যাই নাই। হৃদ্‌রোগের রোগীকে সত্য রুক্ষ কথা বলায় উপকার আছে। আমি বলিলাম, দেখ, মিষ্টার সিংহ তুমি চিনেছ ভালই, আমি কোনও পুরাণ কথা তুলিয়া ভাব কর্ত্তে আসি নাই। আমার কাঠের দরকার, তুমি তার দোকানদার। তোমার কাছে জিনিষগুলি নিলে

অন্ততঃ খাঁটি মালটা পাব, এই বিশ্বাস। দাম দশ টাকা বেশী লাগলোই বা।"

বিজয় যেন একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "আমার টাকার অভাব, তা তুমি জান?"

"টাকার অভাব? তা হলে ত এতগুলি টাকা দেওয়া অন্যায় হয়েছে। যা হোক, আমার মালগুলি যাতে তাড়াতাড়ি পাই সেই চেষ্টা করবেন। বাজারে ক্রেডিট্ না থাকে বলুন, আমি সব টাকাই নগদ দিচ্ছি। আমি শুধু আপনার কাছে এসেছি, মালটা ভাল পাব বলে। কাল রসিদ দিয়ে লোক পাঠাবেন, টাকা আমি দিয়ে দেবো, পারেন আপনি নিজে যাবেন।"

"আজ কতকাল পরে দেখা।" বলিয়া তিনি চক্ষু মুছিলেন। আমি চিকিৎসা বিদ্যায় জানিয়াছি, এমন রোগী কাঁদিতে পারিলে আরোগ্যের দিকে যায়। আমি বলিলাম, "ও রকম অনেক লোকের সঙ্গে অনেক দেখা হয়ে থাকে, কতকাল তা লোকে মনে করে রেখে থাকে?"

আমি সফারকে গাড়ি হাকাইতে বলিলাম। তিনি বিশেষ কোনও শঙ্কটাপন্ন রোগে পীড়িত নন বুঝিয়া তবু অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

পরদিন দেখি তিনি নিজেই আমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। আপনারা বলিতে পারেন, এখন আমি কি করি? কেহ তাহা পারিবেন না। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "বসুন, এসেছেন, ভাল হয়েছে, আমি অন্ত লোকের কাছে এতগুন টাকা দিতাম না।

তিনি বলিলেন, "আমাকেই বা তোমার এত বিশ্বাস কি মাধবী? আমি কারবারে লোকসান দিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছি।"

"তবেই হয়েছে! আমি সেধে গিয়ে এতগুলি টাকা থুইয়ে এলুম!"

"তুমি যদি দশ হাজার টাকা আমায় দাও, আমি বোধ হয় সামলাতে পারি।"

"সে কি আমি পারি? এত টাকা দিয়ে আপনার কারবার বজায় করবো, এত বড় দাতা হবার অবস্থা আমার নয়। বাড়ীটা কচ্ছি, আশী নব্বই হাজার টাকার দরকার। যা'ক, অন্যত্র কাঠ যোগাড় করবো। গেল এই দু'হাজার, আমার খাটুনির টাকা।"

তিনি কাতরেই বলিলেন, "না মাধবী আমি তোমায় মাল দেবো। এখন দশ হাজার টাকা দিলে মহাজনের কাছে আমার ক্রেডিট্ বজায় থাক্‌বে।"

গুড়ি গুড়ি হাটিয়া শকুন্তলা আসিল, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। সে বলিল, "লঞ্জু।" লজেঞ্চুস চায়। বিজয় জিজ্ঞাসিলেন, এ মেয়েটী কে?"

হাসিয়াই বলিতে হইল, "আমার মেয়ে।"

"তোমার আবার মেয়ে কি?"

আমি গম্ভীর হইয়াই বলিলাম,—(পোড়া অদৃষ্টে কত অভিনয়ই করিতে হইল,) "মাপ কর্‌বেন, অত অভদ্রতা করবেন ত, এখান থেকে চলে যান। স্ত্রীলোক আমি, আপনি পরিচিত লোক, লজ্জা সম্ভ্রম করা চলে না। আপনায় টাকা দিচ্ছি, নিয়ে যান; মোদ্দা এর বেশী আমার কোনও পরিচয় চাবেন না।"

নোটগুলি গণিয়া দিলাম। তিনি হাতে লইয়া বলিলেন, "তোমার পরিচয় আমি কি জিজ্ঞাসা করবো?—আমারই পরিচয় তুমি পেলে না।"

তিনি উঠিলেন, আমি দুটো কথা বলিয়াও তাঁহাকে দেরী করাইলাম না। তাহার সঙ্গে বাহির পর্য্যন্ত আসিলাম, বাহিরে আসিয়া তিনি বলিলেন "তোমার দেওয়ালের গায়ে এমন হেনার গাছটী ছিল, তা নাই?"

"তবে কি এ বাটীটা আপনি আগেও দেখেছেন ?" বলিয়া বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "তা দেখ্‌তে পারি।"

তিনি চলিয়া গেলেন। দুই একদিনের মধ্যেই বাসাটী বদলাইয়া, আর একটা পাড়ায় আর একটা বাড়ী ভাড়া লইলাম। সাইন্ বোর্ড আর লটকাইলাম না, খুব গলির মধ্যে বাড়ী লইলাম। বিজয়কে সংবাদ দিলাম, আমি কিছু দিনের জন্য অন্যত্র যাইতেছি, আমার কাঠগুলি যেন প্রস্তুত থাকে।

বক্তা—মিষ্টার-কার (বার-এট-ল)।

(১)

একটা যুগ, বারটা বৎসর ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় করিতেছি। জানি কেবল আইন আর টাকা। অবশ্য প্রেমের বন্ধন মুক্তি বা ডাইভোর্স কেশেই আমার পশার বেশী; কিন্তু প্রেমের অনুভূতি, যাহা নিয়া কবিদিগের বাজে বকাবকি তাহাতে আমি কোনও দিনই নাই। স্ত্রী পুরুষের ভালবাসাবাসি, স্বভাবের ফুলফোটাফুটিরই মত, মাঝে বেশীর ভাগ লাভ লোকসানের খতিয়ান। বৎসরে অন্ততঃ ত্রিশটা ডাইভোর্স কেশ করিয়া এই জ্ঞানটাই আমার পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। সুন্দর বস্তু দেখিলে তাহার প্রতি টান হয়, যেমন ক্ষীরের মিঠাই দেখিলে রসনায় টান পড়ে, তা ছাড়া আর কিছু আমি জানিও না, বুঝিও না।

এবার একটা ডাইভোর্স কেশ করিতে গিয়া, অদ্ভুত রকমের একটা জ্ঞান লাভ হইল। এখনও আমি মনকে বুঝাইতে পারি নাই, বিষয়টা কি। আমার মত কাঠ-কবি গল্প লিখিলে সুসাহিত্যিক কোনও মাসিক পত্র তাহা ছাপিবে না, তাহা জানি; বিশেষ তাহারা সত্যের ধার দিয়াই যায় না, নিতান্ত অসত্য কুৎসিত না হইলে তাহারা স্থান দেয় না। তবু বিষয়টা আমায় দশজনকে শুনাইতে হইবে।

গৃহিণী একটি ছেলে প্রসব করিয়া রোগে পড়িয়াছেন, ডাক্তারগুলি আমার টাকা লুটিয়া লইতেছে, তবুও গৃহিণী বলেন, এখনও তিনি অসুস্থ। আঙ্গুর বেদানার দোকানে টাকা দিয়া হয়রাণ হইতেছি। আরও সেই সঙ্গে উদ্বেগ আশঙ্কায়, আমার টাকা রোজগারের সময়টাও বৃথা নষ্ট হইতেছে, গৃহিণী যদি এখন গঙ্গা যাত্রা করেন তবে এতগুলি বাচ্চা আগ্‌লাবে কে?

এমনি একদিন একটী ফিরিঙ্গি যুবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। রোদে পোড়া আমটীর মতন যুবতীটা যেন পঁচিশ বৎসরেই বুড়ী হইয়া গিয়াছে। মুখখানা যেন একখানি জ্বালার কুণ্ড। তাহার প্রতি নিশ্বাসেই যেন অন্তরের ছটফটানি বিষময় জ্বালা ছিটাইয়া যাইতেছে। বুঝিলাম মোয়াক্কেল হইবেন।

তাহার ব্রিফ্‌টায় মনোযোগ দিলাম। ব্রিফে কয়দিন লেস্ যাইতেছিল, কুল হইবার আশা হইল। তাহার ব্রিফের ব্রিফ্ সে ডাইভোর্স চায়।

এক ধূর্ত্ত বাঙ্গালী যুবক ব্রহ্মদেশ হইতে তাহাকে ফুসলাইয়া, হাসি আলাপ রূপের কৃত্রিম ছবি দেখাইয়া সরলা রমণী সে, তাহাকে ভুলাইয়া, তাহার প্রায় আশী হাজার টাকা সহ তাহাকে এই বাঙ্গালা দেশে লইয়া আসিয়াছে। এই ছ'টা বৎসর সে তাহাকে নিদারুণ

প্রতারণাই করিয়াছে। সে যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে কেবল প্রতারণা মাত্র। এক দিনও সে গির্জ্জায় যায় না; হিন্দুর মত সে কাশী বৃন্দাবন ঘোরে, ঠাকুর দেবতা দেখিলে প্রণাম করে তাহার কিছু ছিল না, এই যুবতীর বলে মস্ত বড় ব্যবসায় গোছাইয়াছে। সে মরিতে যাইতেছিল, যুবতী তাহাকে বাঁচাইয়াছে, তবু সে যুবতীকে ভালবাসে না; ভৃত্যের মতন যোড়হাতে সর্ব্বদাই থাকে, কিন্তু প্রিয় অন্তরঙ্গের মত অবাধ মনখোলা প্রেমের ভাব তাহাতে এই সাতটা বছরেও পাওয়া গেল না। সে কথায় কথায় কৃতজ্ঞতা জানায়, সামান্য একটু সেবা যত্ন করিতে গেলেই কুণ্ঠিত হইয়া বলে, আহা আমি তোমার কিছুই করিতে পারি না, তুমি আমার কত কর। যুবতী এই কপট দাস্যভাবের মধ্যে প্রকৃত বিষয়টা মোটেই বুঝিতে পারে নাই। সন্দেহ হইলে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করিয়াছে। এতটা দিন নিতান্ত সম্ভ্রান্ত অথিতির মতন কেবল আদর সম্ভ্রমে সদা সাবধান সেবার মধ্যে থাকিয়া প্রাণটা যখন তাহার নিতান্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন সে তাহার জন্মস্থান ব্রহ্মদেশে যাইতে চাহিল। তাহার স্বামী তাহাতে কিছু মাত্রও আপত্তি না করিয়া পরম উৎসাহে তাহার যাত্রার সুবিধা করিয়া দিলেন। ছ'টা মাস যে সেখানে কাটাইয়াছে, ইহার মধ্যে স্বামীর গুরুতর পীড়া গিয়াছে। তিনি সে সমস্ত সংবাদ তাহাকে দেন নাই, কেবল পত্র লেখেন, তুমি ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম, ওখানে তোমার শরীর ভাল থাকিলে আরও কিছু দিন থাকিয়া আইস। ফিরিয়া আসিয়া শোনা গেল, প্রতারক একটী বাঙ্গালী যুবতীর সঙ্গে ঘোরে। স্পষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, সত্যই সে এত দিন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেছে না। তাহার ভালবাসার আর একটী লোক

আছে, তাহা হইতে সে মন কিছুতেই ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছে না।

বলিতে বলিতে যুবতীর মুখটা লাল হইয়া উঠিল, চুলগুলি যেন খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, মস্তকের উষ্ণতায় যুবতী মাথার টুপিটা একবার খুলিয়া আবার পরিল। তাহার দাবী বড় কঠোর, লোকটাকে সে ফকির করিয়া ছাড়িবে। তাহার দাবী বিবাহচ্ছেদ, সেই সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ।

আমি বলিলাম, "এত টাকা কি আদালতে মান্‌বে?"

"মান্‌তেই হবে, মিথ্যা কিছু নয়, আমার আশী হাজার টাকা জানোয়ারটা খেয়েছে।"

"টাকাগুলি বিবাহের আগে না পরে নিয়েছে?"

"আগে নিয়াছিল পঞ্চাশ হাজার, তার পর বাকিটা নিয়েছে, আমিত সন্দেহ করি নাই, সেধে দিয়েছি।"

"লোকটা খুব সুরূপ ছিল?"

"নিশ্চয়ই, অমন ফুলটীর ভিতর এত বিষ, তাকি জানি? এখন কিন্তু সে রূপবিলাস কিছুই নাই, পোষাকটাও ভাল করে পরে না, যেন একটা ব্যাকুব বেহায়া।"

যাহা হউক বায়নার সঙ্গে ব্রিফ্‌টা লইলাম। প্রতিবাদীর উপর রুলিং জারি না হইতেই দেখি প্রতিবাদী আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত। শ্বেতাঙ্গের পরিচ্ছদধারী একজন বাঙ্গালী যুবক। যুবক যেন মস্ত বড় একটা ঝড় কাটাইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই ভদ্রলোক কোনও রূপ শিষ্টাচারের অপেক্ষা না করিয়া নিতান্ত পল্লীবাসী বৃদ্ধের মতন আমার হাতখানি জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল, "আপনি আমায় রক্ষা করুন। আপনার ঐ ডাইভোর্স মোকদ্দমায়

আমিই প্রতিবাদী। আপনিই এই খানেই মোকদ্দমাটা মিটাইয়া দিন। আমি ডাইভোর্সে সম্মতি দিতে রাজি আছি। কিন্তু অত টাকা আমার নাই, আমার পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার আসবাব পত্র আছে, বিক্রয় করে যা হয় সমস্ত দিব। বিক্রয় করলে হাজার ত্রিশেক হ'তে পারে। কিন্তু সময় চাই। অন্ততঃ তিন মাস আমায় সময় দিন। ত্রিশ হাজার টাকায় রফা করে দিন। পরে যদি টাকা হয়, আমি দাবীর সমস্ত দিতে রাজি আছি। অবশ্য মোকদ্দমা রফা কল্লে আপনার ফির লোকসান হবে, কিন্তু আমি নিতান্ত নিরুপায়, আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার দাসত্ব কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।"

আমি হতভম্ভ হইয়া পড়িলাম, লোকটার উপর দয়া আসিল। মানুষের মনে ঐ একটা বৃত্তি ফুটিয়া উঠিলে ব্যবসায় বুদ্ধি ডুবিয়া যায়। অব্যবসায়ীর মতই বলিয়া ফেলিলাম, "আপনি মোকদ্দমার উপযুক্ত এড্ভোকেট রেখে জবাব দিন, টাকার ডিক্রি নাও হতে পারে।"

লোকটা যেন কত হতাশে বলিল, "কি আর জবাব দেব মহাশয়, সত্য মোকদ্দমা, ও সত্য আমি কাটিতে পারবো না। দাবীর সমস্ত টাকা দিলেও আমি বাদিনীর কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে মনে করবো না। আদালতের কেলেঙ্কারী হতে আমায় রক্ষা করুন। আপনাকে দেবার মতন আমার কিছুই নাই; আমার সর্ব্বস্বই ঐ বাদিনীর। আপনার বিস্তর আছে, আমায় দয়া করুন।"

আমার কৌতুহল বাড়িল। হাসিও আসিল। গৃহিণী অনেকটা নিরাময় দেখিয়া প্রাণে একটু স্বস্তি ভাবও আসিয়াছে। বলিলাম, "আপনি তবে বাদিনীকে এখনও ভালবাসেন।"

"না না, ভাল তাঁকে কখনও বাস্‌তে পারি নাই; কিন্তু পারা উচিত ছিল। বড় প্রীতিময় প্রাণ তাঁর, অকপটে আমায় হৃদয়ের ভালবাসন

ঢেলে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে সর্ব্বস্ব দিয়েছিলেন। আমি তাই সম্বল করে ব্যবসায় করেছিলাম মাত্র, তাঁর শুদ্ধ সরল প্রীতির বিনিময় কিছুই কর্ত্তে পারি নাই। পাপ যা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত এক জন্মে হবে না। আপনি আমার ইহকালটা রক্ষা করে দিন, পরকালের কর্ত্তার কাছে দয়া চাইতেও আমার ভয় হয়।"

"আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এখনও মোকদ্দমা উঠ্‌তে তিন চার মাস সময় যাবে, ভেবে চিন্তে কাজ করুন।"

"না না মোকদ্দমা আর উঠে কাজ নাই। আমি বাদিনীর দাবিতে সম্মতি দিয়ে দিচ্ছি, আপনি দাখিল করে দিয়ে মোকদ্দমা তুলে নিন। আদালতকে আমি বিশ্বাস করি না, হয়ত বা অন্য রূপ বুঝে বাদিনীর দাবিতে আদালত বিশ্বাস নাও কর্ত্তে পারে। শুধু টাকাটা দেবার জন্য তিন মাস সময় চাই।"

"আচ্ছা আমি বাদিনীকে ডেকে পাঠাই। আপনি বসুন, ফোন কচ্ছি।"

"না না, আমার সম্মুখে নয়, আপনি সব ঠিক করে আমায় কথা দেবেন। আমি আপনার দয়ার উপর নির্ভর কর্ল্লাম। নইলে আমি পালিয়ে যাব, পরলোকে গিয়েও যদি এ দায় থেকে বাঁচি, তাও যাব, আদালতে যাব না কিছুতেই।"

লোকটা যেমন ব্যস্তে আসিয়াছিল, তেমনি ব্যস্তে চলিয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এত রঙ্গ মন্দ নয়।

বসিয়া ভাবিতেছি, সহসা দেখি আমার গৃহিণীর লেডি ডাক্তারটী আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বুঝিলাম, তাহার কয় দিনের ফিটা বাকি আছে, তাগিদ করিতে আসিয়াছেন। আবার একখানা চেক কাটিতে হইবে ভাবিয়া মনটা ভার হইয়া পড়িল। ওটা আমার দোষ, ব্যাঙ্কের চেক আমি হাসিমুখে কাটীতে পারি না। মিস্ বাসু আসিয়া বলিলেন, "আপনিত বড় সুন্দর একটী তামাসার মামলা পেয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আপনি বুঝি লোকটার কথা ঘর থেকে সব শুনেছেন।"

"হ্যাঁ, অনেকটা শুনেছি, আপনার বাড়ীতে এ ক'দিন আসা যাওয়া করে, মোকদ্দমার কথা শুন্‌তে আমার বেশ নেশা জন্মেছে। এর মধ্যে আমারও কিছু লাভ কর্ত্তে ইচ্ছা হ'য়েছে। শুন্‌লাম লোকটা তার আসবাব বেঁচে টাকা দেবে। লোকটার আসবাবগুলি মূল্যবান সন্দেহ নাই; লোকটা মিথ্যা বলে ব'লে আমার মনে হয় না। আমার কতকগুলি আসবাব পত্রের দরকার, আপনি আমায় ঐগুলি কিনে দেন না। প্রয়োজন হয়, কালই টাকা দিচ্ছি, লোকটার উপকার হয়ে যাক। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই বেঁচে যা'ক। উভয়েরই এতে লাভ আছে। মাঝে থেকে আমার কিছু লাভ হলো ক্ষতি কি? তবে আপনার বিশেষ কিছু লাভ হচ্ছে না। দালালী কিছু চান দিতে পারি, তবে আপনাকে তত ছোট করে ত ভাব্‌তে পারি না। বলেন ত আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সুপারিস আনি। কি বলেন?"

বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। ডাই-ভোর্সের এমন জটিল মোকদ্দমা এমন জলের মতন মিটিয়া যাইবে, তাহা ত আমি আমার এত দিনের অভিজ্ঞতায় ধারণা করিতে পারি নাই। বলিলাম, আচ্ছা, ওর জিনিষগুলি একবার দেখে আসুন না। সেগুলি আপনার প্রয়োজনে আসবে কি না পছন্দ হয় কি না, তাই বা কে জানে।”

“তা হবে। সেগুলি পছন্দ না হবে, অন্যত্র বেঁচে ফেল্‌বো। আমার মত একটা মেয়ে মানুষে কিন্‌ছে, তা আপনি বল্‌বেন না। মেয়ে মানুষ শুন্‌লেই লোকটা বেঁকে বস্‌বে। পুরুষ মানুষের পুরুষত্বই ঐখানে,—যাতে মেয়ে মানুষ ঠকাতে পারে। আমি টাকার যোগাড় করি, আপনি লোকটাকে ডেকে কথা স্থির করুন। না হয়, সময় হয়, নিজে একবার জিনিষগুলি দেখে আসুন। মোদ্দা কাজটা আপনাকে করে দিতে হবে, যত সত্বর পারেন।”

ব্যাপার ত মন্দ নয়। বাদিনী পরম ব্যস্ত, প্রতিবাদী তাহার চেয়ে সাত গুণ ব্যস্ত, আবার মধ্যে পড়ে এই আর এক খরিদ্দার তার চেয়ে দশগুণ ব্যস্ত! এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে না কি? শুনেছি, অনেক গুণ্ডা জুয়াচোর এমনি করে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে অনেক কাজ হাসিল করে। এরা যে এক দলের লোক নয়, তাই বা কে জানে। “আচ্ছা, ভেবে দেখি” বলিয়া মিস্ বাসুকে বিদায় করিলাম।

বি, সিং কাঠের আড়তে একবার যাইতে হইল। তিন পাগলার পাল্লায় পড়িয়াছি। লেডি ডাক্তারটা নিতান্ত ভাল মানুষ, গৃহিণীর সঙ্গে বড়ই ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি বলেন তাহারই চিকিৎসা ও সেবায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। নিরীহ সরলা স্ত্রীলোকটী ঠকিয়া যাইবে, একটু দেখিতে হয় বই কি? লাভ এই ব্যাপারেত কিছুই হইবেই না।

গিয়া দেখিলাম, রাজার ঘরের মত আস্‌বাবই আছে বটে। কিন্তু যত্ন মনোযোগের অভাবে বিশৃঙ্খল বিশ্রী হইয়া রহিয়াছে। পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা দাম হইতে পারে! তাহাতে বলিলাম, "আপনি আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া এখন কি করিবেন?"

"কি আর করবো, আর কিছু করার প্রয়োজন রাখে না।"

"বুঝিলাম নিতান্ত ঔদাসিন্য জন্মেছে সংসারে। ব্যাপারটা একটু খুলে বল্‌তে পারেন?"

"নিশ্চয়ই। শুন্‌বেন, শুনুন। একটু সময় নষ্ট হবে আপনার।"

লোকটা গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মস্ত বড় রূপ কথা! গল্পটা বলিয়া ফেলিয়া অবশেষে বলিল, ধন দৌলত বড় মানুষির কল্পনা ছাড়া আরও একটা মিথ্যা মনোবৃত্তি মানুষের আছে, যেটা কারু কাছেই, কোনও মায়ার চাপেই দমে থাকতে চায় না। সেই জন্য এত সুযোগ, এত টাকার সুবিধা পেয়েও আমি ব্যবসায়ে সুবিধা কর্ত্তে পারি নাই। এখন আর পারবার আশা নাই, এখন চাই সব ঝেড়ে ফেলে, একবারে পেছন ফিরে গিয়ে সেই পুরাণ অবস্থায় যদি যেতে পারি।"

"সন্ন্যাসী হবেন বোধ হয়?"

"না না, সন্ন্যাসী হয়ে গাছতলায় ছাই মেখে বস্‌বার মতন মন গড়্‌তে পারি নাই। সেইরূপ টিউশনি করে দিন চালাব, তা অবশ্য জুটবে।"

"হয় ত এই ভাবে আবার মাধবীও জুটে যেতে পারে।"

"না, সে আশা নাই; সে যখন দেখা দিয়ে আবার পালিয়েছে, তখন আর দেখা দেবে না। এখনও সে আমায় ভালবাসে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম জাতি সব গিয়েছে কি না, অস্পৃশ্য ভেবেছে।"

"আমি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেই, একজন লেডি ডাক্তার চাই, হয়ত ধরা পেতে পারি।"

"না না ধরা পেয়ে কাজ নাই, হয় ত আমার দুরবস্থার কথা জানতে পেলে আবার তার যা কিছু আছে, আমায় এনে ঢেলে দেবে। আর এমন ঠকাঠকির ব্যাপারে আমি যেতে চাহি না।"

এমন রহস্যময় ব্যাপারে কি না যাইয়া থাকা যায়? আমিও যে মিস্ বাসুর দালাল হইয়া আসিয়াছি, তিনি আবার ডাক্তার। আমি আস্‌বাব পত্র সকলই খরিদ করিব আশ্বাস দিয়া চলিয়া আসিলাম। তাহার পর ফোন্ করিয়া ফিরিঙ্গি যুবতী রোজী যোসেফ্‌কে ডাকিলাম। সে আসিলে তাহাকে বলিলাম, "তোমার প্রতিবাদী মামলা আপোষে মিটাতে চায়।"

সে যেন ক্ষিপ্ত কুক্কুরীর মত বিকট স্বরে বলিল, "না না, মোকদ্দমা আমি আপোষে মিটাব না। কিছুতেও না, মরে গেলেও না।"

"তোমার দাবি বুঝে পেলে মিটাবে না কেন?"

"আমার দাবি ওর সর্ব্বনাশ করা, ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ভিক্ষা করান। এ দেনায় বডি ওয়ারেণ্ট করে জেলে দেওয়া যায় না?"

"তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে রাস্তায়ই দাঁড়াতে চায়।"

"সর্ব্বস্ব আবার ওর কি! যা কিছু আছে, পাওনাদারেরা শীঘ্রই এট্যাচ্ করবে। একটা নেহাৎ অপদার্থ, সব খুইয়ে ফেলেছে।"

"তবে ত ও রাস্তায়ই দাঁড় হয়েছে। এই বেলায় তুমি যা পাও নাও, ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ও দিতে পারে।"

"ত্রিশ হাজার টাকা? কোথা? তবে নিশ্চয়ই ওর সেই প্রেমিকার দেখা পেয়েছে, সেই টাকা দিচ্ছে, আমি টাকা আপোষে নেবো না।"

"না না, আমি টাকা দিচ্ছি! আমি টাকা দিয়ে ওর সব মাল আস্‌বাব কিনে নিচ্ছি, আমার এতে লাভ আছে। তুমি রাজি হলেই আমি টাকা দেই।"

না না আপনি ও সব কিন্‌বেন না, ও সব রদ্দি মাল। আর সপ্তাহের মধ্যেই ও মহাজনে ক্রোক কর্‌বে। আপনি ওতে যাবেন না।"

"তা হ'লেও তোমার টাকা আদায়ের কোন আশাই নাই। আমি আজই টাকা দিয়ে জিনিষগুলি নিয়ে আস্‌ছি, মহাজনে আমার কি করবে?"

"না না, আমি টাকা নেবো না, মামলা করবো।"

যুবতী অস্বাভাবিক ভাবে হাত পা ছুড়িয়া, বিকট মুখভঙ্গি ভ্রূভঙ্গি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "তবে তুমি ওকে গুলি করে মেরে ফেল না।"

"তাই উচিত, কিন্তু ওকে এখন মার্‌বো না, ওকে একবার বাঁচিয়ে ছিলাম, এখন মার্‌তে পারি না। ওঃ, ঘা দিয়ে স্কিন্‌কে ধরে রক্ত উঠ্‌বে, তা ত পারি না।"

"তবে আপাততঃ টাকা ত্রিশ হাজার নিয়ে ছোলেনামা সই কর। তারপর দেখা যা'ক লোকটা কি করে। আর ত ওর কিছু নাই, দেখ্‌ছি তুমি ওকে দরদও কর, এই পর্য্যন্ত রেহাই দাও, আমার অনুরোধ।"

মহিলাটীর প্রকৃতিতে কোমলতা ছিল, বড় যাতনায় এমন খট্‌খটে কাঠ হইয়া পড়িয়াছে। অগত্যা আমার প্রস্তাবে রাজি হইল।

পরদিন মিষ্টার সিং আসিলে বলিলাম, "মশাই, আপনি নাকি মহাজনের অনেক দেনদার, তারাও শীঘ্র আপনার মাল ক্রোক দিবে।"

"তা হতে পারে, আপনি আজই মালগুলি নিয়ে আসুন।"

"আচ্ছা, আপনি যদি এখন মাধবীকে পান তবে কি করেন?"

"কিছু করি না মশাই। আপনাকে নেহাৎ মুরুব্বি ভেবে কথাগুলি বলে ফেলেছি, আপনি এখন এমন বিদ্রূপ কর্লে বড়ই ব্যথা পাই।

"আচ্ছা, কাল সকালে, আপনি উকিলের স্বাক্ষর করিয়ে সম্মতি পত্র লিখে দেবেন, টাকা আমি বাদিনীকে দিয়ে দেবো। আজ এখন যান।"

লোকটা পকেট হইতে একশ টাকার পাঁচখানা নোট আমার টেবেলে রাখিল, বলিল "আর আমার নাই, এতেই মাপ করুন।" আমি বলিলাম, "আপনার আজকার খাবার খরচ আছে ত ?

"হোটেলে এক সপ্তাহের খরচ জমা দিয়েছি মশাই, ধারের ভিতর আর যাচ্ছি না।"

"যা গিয়েছেন ?—মহাজন গুলিকে ত একদম মেরে দিলেন ."

"তারাও অমনি তাদের মহাজনকে মার্বে। আমায় কি আমার পাইকাড়্রা মারে নি ?—দুনিয়ার কারবারই মারামারি।"

লোকটার স্ফূর্ত্তি যেন খুলিতেছে। খুব দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

মিস্ বাসু টাকা লইয়া আসিলেন। আমি বলিলাম, "জিনিষগুলি যে আজই আন্‌তে হবে, নইলে মহাজনে ক্রোক্ করে নেবে।" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আবার মহাজন কি ?"

"লোকটা মহাজনদের অনেক ধারে। তারাও নালিস চড়িয়েছে।"

"তবে ইনসল্‌ভেন্সি নেয় না কেন ?"

"তা সে জানে। মোদ্দা দুই এক দিন মধ্যে মালগুলি না আন্‌লে, আপনার টাকা যাবে।"

"আচ্ছা সে জন্ম ভাবনা নাই, আমি তার বন্দোবস্ত কচ্ছি। আপনি টাকা দিয়ে মামলাটা ত মিটিয়ে দিন।"

এবার আমি স্পষ্ট হাসিলাম। বলিলাম, "আপনার তবে মামলা মিটাবার দরকার, মাল পত্রের দরকার তত নয় ?"

মিস্ বাসু বিমনা হইলেন। আমি তবু বলিলাম, "বুঝি লোকটাকে আপনার খুবই দরকার, আপনার কাছে বহু মূল্য ? কিন্তু নেহাৎ লাট রদি মালের মতই হয়ে পড়েছে।"

মিস্ বাসুর চোক দুটী একটু যেন জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই অতি শিষ্ট হইয়াই বলিলেন, "আমি আপনার স্ত্রীকে দিদি বলেছি, কুৎসিত বিদ্রূপ করে লজ্জা দেবেন না।"

"তবে ত বেশ হলো, অন্ততঃ শিষ্ট আনন্দ কর্ত্তে আমার অধিকার হলো! বল ত বোন্, এখনও কি অপদার্থটার পরে তোমার মমত্ব আছে ?"

আমার স্নেহ স্পৃষ্ট কোমল কথাটীতে বালিকা মুহূর্ত্তের মধ্যেই মলিন হইয়া গেল ; তাঁহার সুন্দর মুখখানি অতিরিক্ত লাল হইয়া যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দুটীর কূলে কূলে জল, যেন অম্লান নীল পদ্মের দুটী পাপ্‌ড়ী শিশিরে ডুবিয়া গিয়াছে! আমার মত নীরস কাষ্ঠ গলিয়া গেল। বলিলাম, "ভগিনী, সংসারের যে অতি শুদ্ধ সত্যটা এতকাল আমার চক্ষে অবরুদ্ধ প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তারই আবরণ তুমি খুলে দিলে। তোমার পবিত্র হৃদয়ের প্রীতি-বসন্তের হাওয়ায় যার হৃদয় কুসুমটী একবার ফুটিয়াছিল, শত বর্ষা হিমের পরিবর্ত্তনেও তা একেবারে শুকিয়ে বিরূপ বিশ্রী হয়ে যায় নাই! আমি আশ্চর্য্য ভেবেছিলাম, বাঙ্গালী ব্যবসাদার যুবক কেমন করে এমন সত্যপ্রিয় হয়। চল ভগিনী ভিতরে চল, তোমার দিদির কাছে আশ্রয় নিয়ে, হৃদয়ের তরঙ্গ প্রশমিত কর। প্রজাপতির কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।"

মাধবীকে লইয়া গৃহিণীর কাছে গেলাম। তখনও মাধবীর চক্ষে জল। গৃহিণী দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "কি ? এমন মুখ ভার করে কেন ডাক্তার লেডী ?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে না কি দিদি ডাকে, তাই একটু ঠাট্টা করেছিলাম।"

গৃহিণী একবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, একবারেই অগ্নিমুখী ! "কি বেইমানী কাণ্ড ! ভদ্রলোকের এই কীর্ত্তি ? বাড়ীতে পেয়ে ভদ্র নারীর এমন অপমান ! দড়ি কলসী জোটে না সর্ব্বনেশে !"

মাধবী তাহাকে ধরিয়া বসাইল। গৃহিণীর রকম দেখিয়া সে চক্ষে জল ভরা থাকিতেও একটু হাসিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, "তা বলে তোমার বোনের বাসরে ছুটো ফষ্টি নাষ্টি না করে আমি পারবো না, তুমি মারো আর গাল দাও। কম খাটি নাই আমি এই ঘটকালিতে !" বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

মোকদ্দমা মিটিল। রোজি বিবি টাকা লইয়া একবারে গিয়া জাহাজে চড়িল। বাংলার মাটীতে আর সে থাকিবে না। মিস্ বাসুর টাকা দেওয়াই সার হইল, ছুদিনের মধ্যে জিনিষগুলি আনার চেষ্টা হইল না, আমি এতটা মনেও করি নাই। অবশ্য নিজের হইলে করিতাম। আর অন্য দিকে কৌতুহল গিয়া ওদিকে বড় নজরও ছিল না। মহাজনেরা আসিয়া মিষ্টার সিংএর জিনিষপত্র সব ক্রোক দিয়া লইয়া গেল। তবু বলিলাম একটা মোকদ্দমা দেই, মিস বাসু বলিলেন "না থাক্। তারাও ত পাবে ॥"

বঙ্কা—সতীশ চন্দ্র।

(১)

বড়ই ত বিপদ, বিজয় সিংহকে এখন খুজিয়া পাই না! মাধবী জুতা মোজা ছাড়িয়া, লাল পেড়ে একখানি সাড়ী পরিয়া, শুদ্ধ বাঙ্গালীর কুলবধূর মত গৃহের কোণে আশ্রয় লইয়াছে। কেহ ডাকিতে আসিলে ফিরাইয়া দেয়, বা অন্য চিকিৎসকের কাছে পাঠায়। বলে টাকার আর তাহার দরকার নাই। আমি বলিলাম "টাকার দরকার না থাকে, বিনা টাকায় কর না? পুণ্যত আছে।" সে বলিল, "পুণ্যেরই বা দরকার কি? মানুষ বাঁচাইলে পুণ্য হয় তারই বা বিশ্বাস কি? রোগে ভুগিয়া যত লোক বাঁচিয়া যায়, তার অনেকেরই না বাঁচিয়া মঙ্গল ছিল। বাঁচিয়া মরণের চেয়েও কষ্ট পায়। আবার চিকিৎসা করিলেই যে মানুষ বাঁচে তাহাও বিশ্বাস হয় না। কত কঠিন রোগের রোগী বিনা চিকিৎসায় বা কুবৈদ্যের ভুল চিকিৎসায়ও বাঁচিয়া যায়। পৃথিবী থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রটা উঠিয়া গেলেও পৃথিবীর যে বিশেষ অনিষ্ট হয়, সে বিশ্বাস আমার নাই।"

ইচড়ে পাকা মেয়েটার লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া রাগ হইল। কিছু বলিতে পারিলাম না; কত স্নেহ যে তাহাকে করিয়া ফেলিয়াছে! সে আরও বলিল, "টেবল চেয়ারগুলি তুমি নিয়ে যাও, না নাও, আমি বেঁচে ফেল্‌বো। পোষাকগুলি বৌ দিদিকে দিয়ে দাও।"

আমি বলিলাম, "শকুন্তলা মেয়েটা?"

"ওটাকে আর কাকে দেব? ঐত বিদ্যা ফলিয়ে ওটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, ওর মাটাকেত বাঁচাতে পাল্লুম না। ওত বেঁচে আছে, সংসারের কাছে ঘৃণা আর অপমান পেতে। যাক, তুমি আমাকে কোনও পাড়াগাঁয়ে একখানা কুড়ে বেঁধে দাও, আমি ওকে নিয়ে সেইখানেই থাকবো। অত চ'কের সম্মুখে সহরে আমি থাকবো না।"

"কেন? তোরত সেই পাড়াগাঁয়ে আম গাছ তলায় বাড়ী পড়ে আছে, সেখানে কত টোপা কুল আর সজিনা ডাঁটা।"

মাধবী একবারে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "দাদা, এমন বিদ্রূপ তুমি করবে, তাত বুঝি নাই। বুঝলাম আমার কেউ নাই। কেউত ছিল না, সেইত ভাল।"

বড় ব্যথা পাইলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম বিজয়কে না সন্ধান করিয়া আর মাধবীর সম্মুখে আসিব না। মিষ্টার করও আমার সহযোগী হইলেন।

সেও একটা মাঘের রাত, শ্বশুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, না গেলে নয়। যাইতে হইল। সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া সারিয়া বাড়ীতে ফিরিতে হইবে। কথা আছে ভোর ছ'টায় আমি আর কর সাহেব হুগলিতে গিয়া বিজয়ের সন্ধান লইয়া আসিব। কর সাহেব নাকি সংবাদ পাইয়াছেন তেমনি একটা লোক সেখানে আছে।

দশটার আগেই আহার করিয়া উপরের বারাণ্ডায় বসিয়া হাত ধুইতেছি, আর নীচেয় শুনিতেছি, ঝি ডাকিল, "ও মাষ্টার মশাই, বলি ভাত টাত খাবে?" বিশেষ মৃদু কণ্ঠে উত্তর হইল, "হ্যাঁ, খাব বই কি। দিলেই খাই।"

"ভাত কি ঐ বিছানায় গিয়ে দেবে? তুমিত কেবল ঘুমুতেই শিখেছ। কে রোজ রোজ ডাকা হাকি করে বল দিনি।"

"কই না, ঘুমুই নেই ত, এক ডাকেই ত উত্তর দিয়েছি।"

"তবে অমন ভাবে পড়ে না থেকে, ছেলেটাকে আর একটু পড়ালেইত পার্ত্তে।"

"ছেলে ত পড়লো না, ঘুম পাচ্ছে বলে চলে গেল।"

"ছেলে চলে গেল। তুমি ত মাষ্টারি করেছ ; ছেলে যদি চলে গেল, তবে তুমি আছ কেন ? কেবল খেতে আর শুতে ? আশ্চর্য্য মানুষ বাবা, ঘরের বার হতেই মাথা কাটা।"

"ঘরের বার হয়ে লাভ কি ? ঘরে থাকাই ভাল। আমি হচ্ছি গৃহ শিক্ষক ! ঝি চাকর ত নই।"

ঝিটা একবারে গর্জ্জিয়া উঠিল, "বটে ! এত কথার ঘটা ! আমি ঝি চাকর, ছোট লোক ! ঘরের বার হয়ে এসেছি ! এত বড় কথা ! আমি শান্তিপুরে গয়লার মেয়ে, বলে ঘরের বার হয়ে খানকি হয়ে এসেছি ? মিন্‌সে মাথা নাড়ে না, কথা বলে না, এখন তার কথার ঘটা দেখ। ভালর জন্য আমি খেতে ডাক্‌ছি, তার উপর এত বড় কথা ! বেহায়া ব্যাটা, ব্যাকুব ব্যাটা, বেয়াদব বেল্লিক ব্যাটা ! আমি ঝি, আমি চাকর, যেন ওর চাকর ? আমি চাকর, আর ওনি লাট সাহেব ! নচ্ছার হাবাতে ব্যাটা ! ইত্যাদি।"

শুনিয়া শুনিয়া আমি বড় বিরক্ত হইলাম। মাষ্টার ভদ্রলোকের ছেলে সন্দেহ নাই ; তাহাকে ঝি এমন বেইমানী গালাগালি দিতেছে ! আমার শাশুড়ী সেখানে ছিলেন। বলিলাম, "একি ? ঝিটা মাষ্টারকে এমন গাল দিচ্ছে মিছেমিছি ! বড়ইত বেয়াদব ?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন, "ও বড় দায়ে পড়েছি বাবা। ঝিটা ঐ রকমই প্রখরা ! রাত্রি দিন ছট ফট করে কাজই করে, একলা পাঁচ জনের কাজ কর্ত্তে পারে, বসা আলসে লোক মোটেই

দেখ্‌তে পারে না। আবার একটা মাষ্টার রেখেছি, সেই যে এবাটীতে ঢুকেছে, প্রায় এক মাস হলো একটীবারও ওকে বাইরে-যেতে দেখ্‌লাম না। সকাল থেকে ৯টা আর সন্ধ্যা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত ছেলে নিয়ে থাকে, পড়ায় বড় ভাল। কিন্তু ঘরের বার কিছু-তেই হয় না, ঘরে দোর দিয়ে শুয়েই থাকে। লোকটা খুব ভদ্র ঘরের ছেলে সন্দেহ নাই, মাথাটা যেন একটু খারাপ। খায়, থাকে, মাইনে পত্র কিছু চায় না।”

ওদিকে ঝির কিন্তু মুখ চলিতেছিল, “বোকা, অকম্মা, বজ্জাত, গতরশোকা, কলুর বলদ, ইত্যাদি কত বিশেষণেই মাষ্টারকে সে উপাধি যুক্ত করিতেছিল। হঠাৎ মাষ্টারও যেন গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল, “চুপ রহ হারামজাদী! ফিন বাত বোলগে ত হাড্ডি তোর দেগা?”

আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ গলার আওয়াজ যেন চেনা? শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বলিলাম “মাষ্টারটীর নাম কি মা?” তিনি বলিলেন, “কি জানি নামটী কি বলেছিল, মনে আস্‌ছে না, খোকা ঘুমিয়েছে, সেই জানে।”

“আচ্ছা, ওঁকে একটু উপরে ডাকুন ত:”

মা ঝিকে মাষ্টারকে উপরে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। ঝি সেই খানে দাঁড়াইয়া বলিল, “কোথায় তোমার মাষ্টার মা! সে এতক্ষণ ঐ চৌমাথায়! র‍্যাপারটা মুড়ি দিয়ে ছুট দিয়েছে! একটা পাগল কোথাকার।”

আর ত বিলম্ব করা চলে না। শ্বশুরবাড়ী হইতে আসা তাড়াতাড়িও চলে না। কেউ ত আস্‌তে দেবেনই না। জুতা জোড়া কুড়াইয়া পাইতেই পাঁচ মিনিট দেরী হইয়া গেল। কোনও উপরোধ না মানিয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখন প্রায় এগারটা, মাঘের

কনকনে শীত। গাড়ী টেকসিতে চলিলে চলিবে না। হাটিয়াই চলিতে হইল। কোন্ দিকেই বা যাই? বড় রাস্তাটা বাহিয়া খানিক দূরে চলিলাম। তাহার পর ভাবিলাম, ভুল করিয়াছি, এত সদর রাস্তায় সে আসে নাই। ফিরিয়া মোড় পর্য্যন্ত গিয়া গলির মধ্যে ঢুকিলাম। অনেক দূর গিয়া দেখি, একটা যায়গায় অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া হল্লা করিতেছে। একটী স্ত্রীলোক খুব বকিতেছে! দেখিলাম তাহারই মধ্যে আমার আসামী। বিজয় একবারেই উন্মাদ! কেহ মাতাল বলিয়া গালি দিতেছে, কেহ মারিতে যাইতেছে। একবারে বেহুস উন্মাদ বিজয় বলিতেছে, "আমি ঠাকুরমাকে খুঁজতে এসেছি। এমনি একদিন শীতের রাত্রিতে আমি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলুম। তখন আমি মাষ্টারি কর্ত্তাম। ঠাকুরমাকে ধাক্কা দিয়ে আমার মাষ্টারি কেটে গেল, প্রথমে সরকার, তারপর অধিকারী, তারপর মাধবী! হ্যাঁ, ঠাকুরমা; তুমি আমার ঠাকুরমা নও? তোমার বড় শীত পাচ্ছে, এই নাও আমার র‍্যাপারখানা, গায়ে জড়িয়া নাও।" বিজয় একটী স্ত্রীলোকের গায়ে র‍্যাপারখানা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। সকলেই হৈ হৈ করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটী অকথ্য বলিয়া গালি দিল। আমি ভিড় ঠেলিয়া গিয়া বিজয়ের হাত ধরিলাম। আমাকে দেখিয়া সকলে সরিয়া যায়গা দিল। আমাকে দেখিয়াই বিজয় বলিল, "এই যে সতীশবাবু! আপনাকে কিন্তু আমি এখনও চিনি না। এই সবে আমার মাষ্টারি আরম্ভ হয়েছে, এর মধ্যেই তুমি এলে কেন ভাই?"

আমি সকলকে ভদ্রলোকের ছেলে মাথা খারাপ হইয়াছে, মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিয়া বিজয়কে লইয়া একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া চড়িয়া পড়িলাম। পথে বিজয় এলোমেলো অনেক বকিল। এক-

বার ট্যাক্সি হইতে লাফাইয়া পড়িতে যায়; বলে "পায় পড়ি দাদা, গাড়ি বড় তাড়াতাড়ি যায়; আমি অত তাড়াতাড়ি পছন্দ করি না। আস্তে, আস্তে, শবুরে মেওয়া ফলে।"

ট্যাক্সি মাধবীর দ্বারে আসিয়া থামিল! বিজয়কে লইয়া নামিয়া পড়িলাম। বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতে লাগিল; হায়! একি কুড়াইয়া লইয়া আসিলাম? মাধবী কি সইতে পারিবে?

দ্বারে কড়া নাড়িতেই, মাধবী আসিয়া দ্বার খুলিল। মাধবী চমকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, পড়িয়া যাইতেছিল, সামলাইয়া গেল। মেয়েটার মনের বল অনেক।

বিজয়ের একবারে বাক্‌রোধ। এত যে বকাবকি করিতেছিল, একবারেই নীরব! যেন কোনও জড় প্রস্তর মূর্ত্তি। ঘরে গিয়া বসিলাম, বিজয়ও বসিল। মাধবীকে বলিলাম, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে! ভয় নাই, অল্পেই বোধ হয় আরাম হবে। বিজয়ের খাওয়া হয় নাই। ঝিকে ডাকিয়া খাবার আনিতে দিলাম। কর সাহেবকে সংবাদ দেওয়ার কৌতুহলটা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না। ফোন করিলাম। কর সাহেব বলিলেন, আচ্ছা আমি আস্‌ছি! আইন ঘসা ব্যারিষ্টারটারও উদ্বেগ কম ছিল না। এই রাত্রি সাড়ে এগারটায়ও বলিল আস্‌ছি। ঝিকে বলিলাম, 'ভাল করে চা কর। একবারে শীতে জমাট ধরে যাচ্ছি। আবার কর সাহেব আসছেন।"

বিজয়ও শীতে কাঁপিতেছিল, শুধু একখানি র‍্যাপার গায়ে মাত্র মাধবীকে দেখিলাম, কয়েকবার একখানা র‍্যাগ হাতে তুলিয়া আবার রাখিয়া দিল। বুঝিলাম লজ্জার অনুরোধে সে র‍্যাগখানা বিজয়ের গায়ে জড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। হাজার হউক বাঙ্গালীর মেয়ে ত।

আমি র‍্যাগ খানা আনিয়া বিজয়ের গায়ে জড়াইয়া দিলাম। বিজয় এখন বেশ পাথরের ঠাকুরের মত বসিয়া আছে। ঝি খাবার আনিয়া দিলে সম্মুখে থালা রাখিয়া খাইতে বলিলাম। বিজয় খাইতে লাগিল। ক্ষুধা খুবই পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল, অনেকগুলি খাইল; আমি দেখিলাম, এতগুলি ঠাণ্ডা লুচি পুরী মিষ্টান্ন খাওয়া ভাল নয়, সম্মুখ হইতে থালা সরাইয়া নিলাম। হাত ধুইতে বলিলাম, হাত ধুইল। তারপর তাকে শোয়াইয়া দিলাম।

তখনই বাহিরে গাড়ির শব্দ শুনিলাম। কর সাহেব আসিয়াছেন। আরে একি!—মিসেস্ করও সঙ্গে! তাহারাও কি ব্যাপারটা এত মন দিবার মত ভাবিয়াছেন?

বক্তা—মাধবী।

সেইত একটা জড় মনুষ্যদেহ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সাত দিনের মধ্যে একবার দেখিতেও আসিলেন না। মিসেস্ কর প্রত্যহ একবার দেখিতে আসিতেন। তিনি কথা কাহারও সঙ্গে বলেন না, কিন্তু শকুন্তলার হাত এড়াইতে পারেন না। তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা তাহার বলিতে হয়। তাহাতেই বোঝা যায় তাঁহার বাকশক্তি একবারেই নষ্ট হয় নাই। শকুন্তলা যদি বলে, "গালি দেখ্‌বো চল।" অমনি তাহাকে লইয়া বারাণ্ডায় গিয়া বসেন। শকুন্তলা যদি বলে, "সন্দেশ খাব।" তখনই

ঝিকে বলেন সন্দেশ আনিতে। শকুন্তলা বলে, "চল বাগানে বেলাতে।" অমনি তাহাকে লইয়া পার্কে বেড়াইতে যান। মন্দ না। শকুন্তলাই হইল তাঁহার জীবন শক্তির চালক। নিজের যতটা ডাক্তারি বিদ্যা ছিল তাহাতে বুঝিলাম, বহু ঘাত প্রতিঘাতে বিশৃঙ্খল মনোবৃত্তিগুলি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শিশুর কোমল মধুর অকপট আদরে তাহা যাহা একটু সতেজ হইতেছে। একটু আশা হইল বই কি? ভাবিলাম বড় একটা ডাক্তার ডাকি। আবার ভাবিলাম ডাক্তার ডাকিয়া লাভ কি? ডাক্তারেরা রোগ সারিতে আসে না, রোগের বড় বড় নাম ও ঔষধ বাতলাইয়া পয়সা লুটিতে আসে। আমি নিজেইত একজন তাই। আমাদের শাস্ত্রে আছে, স্বয়ং শিবঠাকুর চিকিৎসা বিদ্যা ও ঔষধ প্রচার করিয়াছেন, তবু যমের অধিকার বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার কৌশলে, রোগে ঔষধে আর চিকিৎসকে কখনও মিল হইবে না, সুতরাং নির্দ্ধারিত নিয়তি দিনে যমের অধিকার কেউ কাড়িয়া নিতে পারিবে না। আমি ত দেখিতেছি, ইনি এখন যমের কাছে গিয়া জুড়াইতে পারিলেই বাঁচেন। কিন্তু আমার যে বড় প্রয়োজন, ইঁহাকে বাচাইয়া রাখা। ইঁহাকে লইয়া আমি ইহকাল ভোগ করিব, এ বাসনা ত আমি ত্যাগ করি নাই। পরকাল, পড়ে থাক তা অনেক দূরে! সবে এই চব্বিশ বৎসর বয়স আমার, আমি কি ইহকাল ছাড়িয়া পরকালের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি? আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, জীবনপথের ধ্রুবতারা, আমার হারাণো মানিক, ডোবা তরী, কত সাগর ছেঁচে আমি কুড়াইয়া পাইয়াছি, আমি কি তাহা ভোগ করিতে পাইব না? আমি ত সন্ন্যাসিনী নই। আমার যে বড় সাধ, আমি ভাত বাড়িয়া বসিয়া থাকিব, তিনি কর্ম্মক্লান্ত দেহে

আসিয়া খাইতে বসিবেন। আমি বিরহ-শয্যায় শুইয়া ছটফট করিব, তিনি কর্ম্মের ভিড়ে অনেক রাত্রি কাটাইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িবেন। আমি আমার বাড়া ভাত অথিতিকে দিয়া উপবাস করিব, তিনি আমার শুষ্ক হাসি মুখ দেখিয়া বলিবেন, তোমার মুখটী শুকিয়ে গেছে কেন? আমি হাসিয়া তাহার কথা ঢাকিয়া দিব। আমি কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার আলেপনা দিয়া সারা ঘরটী সাজাইয়া ফেলিব, পাড়ার দশ এয়ো ডাকিয়া হুলুধ্বনিতে গৃহস্থল পূর্ণ করিয়া আড়ির ডালি পাতিব, তিনি হাড়ি হাড়ি মিষ্টান্ন আনিবেন, আমি তাহা শত নিমন্ত্রিতকে সাজাইয়া বাটিয়া দিব। তাঁহার জন্ম তিথি দিনে আমের বোল আর বকুলের মালায় সমস্ত গৃহ সাজাইয়া দিব—সে ফাল্গুন মাস আমার মনে আছে, তিনি কত আনন্দ সাবধানে নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন। যে দিন আমার রান্না খারাপ হইবে, সে দিন তাঁহার ভাল খাওয়া হইবে না, সেই উপলক্ষে আমি পাঁচ রকমের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিব। সেই মিষ্টান্ন তাঁহার বন্ধুদিগকে খাওয়াইয়া আমার আরও আনন্দ হইবে। তিনি রাগ করিলে আমি রাগ করিব না, তাঁহার উদ্বেগ অশান্তির সময়ে আমি অভিমান কৌতুক কিছুই করিব না, যখন দেখিব তিনি বেশ প্রফুল্ল, তখন একটা কিছু ছুতানাতা ধরিয়া অভিমান করিব। তিনি আমার অভিমান দূর করিতে যত্ন করিবেন, কিন্তু কোনও ব্যথা বোধ করিবেন না। আর যদি কখনও,—স্ত্রীজাতির আশা কতই আকাশে সৌধ রচনা, যদি কখনও—খোকাখুকী কোলে আসে, কত কলহ করিব তাঁহার সঙ্গে সেই শিশুর যত্ন আদর নিয়া! এ সাধগুলিত আমি ত্যাগ করি নাই কখনও। সাগরবক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই পাতালের দেশ মার্কিন মুলুকে গিয়া একবারে যে ইহলোক ছাড়া

আর একটা লোকে গিয়াও এ সাধ আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই। ডাক্তারবিবি সাজীয়া দৈনিক একশত টাকা রোজগার করিয়াও এ বাসনা আমি বিসর্জ্জন দেই নাই। আমি জানি আমার বিজয় আমারই হইবে। সে যে আমার সাধনার সামগ্রী, তপস্যার বর, বহু জন্মের অনুষ্ঠিত পুণ্য; আমি যে তাঁহারই জন্য ধরায় আসিয়াছি। আমার এ কামনা কি ব্যর্থ হইবে?

একদিন আমি তাঁহার পা খানি ধরিয়া বলিলাম "কেন এমন হলে প্রাণাধিক?"

তিনি শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াই বলিলেন, "বিশ্ব-বিদাহী দাবানল, তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ অতি সঙ্কীর্ণ—পথ, আমাকে বলিয়া দিল এর মধ্যেই সুখ, ঐশ্বর্য্য সম্পদ যশ। শৈত্য নাই, সরসতা নাই, তবু সুখ আছে। সেই পথেই প্রবেশ করিলাম, সুখ আমি চাই-ই চাই। দূরে! দূরে! ঐ দূরে রজত কূপ! ঐখানেই সুখ! যার বিন্দুর অভাবে আমার দুঃখ, তার স্তূপ আমাকে অধিকার করিতেই হইবে। কত দীর্ঘ সে পথ। সে পথে অসংখ্য সূচীর মত কণ্টক, তা হোক, আমাকে ঐ পথে যাইতেই হইবে। ঐত দেখা যায় আমার কাম্য রজত পর্ব্বত, চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে! চলিলাম, রক্ত শুকাইয়া যায়, চর্ম্ম দগ্ধে যায়, হাড়ে গিয়া অগ্নি শিখা লাগে, তবু যাইতেই হইবে। কত কাল কত যুগ চলিলাম। সে মরীচিকা ধরা যায় না, কেবল দেখা যায়। সহসা কে বলিয়া দিল, ও মৃগতৃষ্ণিকা, ধরা যাবে না। সেইখান থেকে আবার ফিরিলাম। সম্মুখে অগ্রসর বরং সহজ, পিছন ফেরা আরও শক্ত। হোক্, তবু ফিরিতে হইবে। পুরাণ কথা মনে আসিল। ফিরিতে পারিলেই সুখ না থাক, স্বস্তি আছে। মনে হইল সে যে আমার বড় আরামের, বড় স্বস্তির

অবস্থা! সেইখানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। হয়ত তাহা নাই, হয়ত তাহা আর পাইব না, তবু ফিরিব। ফিরিতে উল্টা বাতাসে সে আগুন দ্বিগুণ জ্বালা দিল। তবু আমার জয়, আমি ফিরিতে পারিয়াছি। ফিরিয়া দেখি এ যে অতি শীতল, অতি কোমল। এত দাহের পর ত এত শীতল সয় না। অসাড় হয়ে যাই যে! দাহের ক্ষতে শীতস্পর্শে বড় জ্বলে উঠে। বাতাস কর, বাতাস কর, মাধবী; আস্তে, আস্তে, অত প্রখর বাতাস ত সইতে পারি না। পাখা টান, যেন হাওয়া না বয়! গায়ে হাত দাও, যেন কোমল মোলায়েম না ঠেকে, সরবৎ খাওয়ায়, অত মধু মিষ্টি দিও না। আর কি করবে? ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, যাতে ভাল হয় তাই কর।

কথা যেন প্রবল ফোয়ারা বেগে ছুটিতে লাগিল, রুদ্ধ স্রোত যেন খুলিয়া গেল। এ অপেক্ষা রুদ্ধ বাকই যে ভাল ছিল। কথা! কেবলই কথা। সে কথার ঝড়ে শকুন্তলা কাঁদিয়া দিল। তবু ঝড় থামিল না। এইবার আমি হতাশ হইলাম।

)

পর দিবস অতি প্রত্যুষেই মিসেস্ কর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের প্রৌঢ় বয়স, পূর্ণাঙ্গ দেহ, নধর বলিষ্ঠ, গৌরকান্তি হইতে যেন রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতেছে। পরিধানে রক্ত বসন, রক্ত উত্তরী স্কন্ধে, ললাটে রক্ত চন্দনের ফোটা নয়নে চন্দ্র দীপ্তির মতন শান্তোজ্জ্বল করুণা। অধরে অস্ফুট

মধুর হাসি। মিসেস্ কর ব্যারিষ্টার সাহেবের গৃহিনী হইলেও ব্রাহ্মণ সাধুর প্রতি অকাট্য বিশ্বাস ভক্তি। তিনি বলিলেন, "ইনি স্বস্তয়ন করিবেন, রোগ আরোগ্য হইবে। ব্রাহ্মণ অবধূতের উপর আমার বিশ্বাস ছিল না, তবু এ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ভক্তি আসিল। পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম।

ব্রাহ্মণ ঘট পাতিলেন। ধূপ দীপ জ্বালিলেন পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিলেন। তারপর অতি অপূর্ব্ব পুলক-সঞ্চারী রুদ্র মধুর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন। সে স্বরতরঙ্গে বিকারীর প্রলাপ দমিয়া আসিল। কথা বলিবার অবকাশ পাইলেন না। সেই স্বরতরঙ্গ, গতী লহরী বিবিধ মূর্চ্ছনাভঙ্গে চলিতে লাগিল। গৃহ স্বরময় হইয়া উঠিল, প্রাচীরে প্রতিধ্বনি আহত প্রতিহত হইতে লাগিল। পঠনের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই! অবসাদ নাই, শ্রান্তি নাই। শিশু শকুন্তলাও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

কত রূপে কত ভাবে সে নমস্কার মন্ত্র! শক্তি, বুদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, লজ্জা ঘৃণা, সর্ব্বরূপেই নমস্কার। ভক্তি, মায়া, ভ্রান্তি, সকলই তাঁহার বিভূতি! তথাপি রোগী কি বলিতে যাইতেছিলেন, অবকাশ পাইলেন না। মধু কৈটব, মহিষাসুর, রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ, নিশুম্ভ বধ হইল, একই মহাশক্তির প্রভাবে। সর্ব্বদেবতা তটস্থ হইয়া স্তুতি গাহিলেন। দেবী আশীর্ব্বাদ করিলেন, অভয় দিলেন।

রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুরোহিত শান্তিজল তাহার মস্তকে দিয়া, তাঁহাকে কবচ মন্ত্রে ঝাড়িতে লাগিলেন। রোগী সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন,—অতি ধীরে আর্ত্তস্বরে, "এই কি আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইল, তুমি শুদ্ধ পবিত্র।"

"দেবী এমনই ভ্রান্তিময়ী।"

"আমার শুদ্ধ শক্তিময়ী।"

"শক্তিতে আমার ভ্রান্তি কেন ?"

"তা না হ'লে জীব জীবকর্ত্তার সমান হয়। স্রষ্টা সৃষ্টকে সমান রাখ্‌লে, সৃষ্টি বৈচিত্র থাকে না, তাঁর লীলা ফুরিয়ে যায়।"

"নিশ্চয়ই। তিনিই ভ্রান্তি, এই জ্ঞান হলে ভ্রান্তিতে জীবের নিজস্ব বোধ রহিল না। তখন আর ভ্রান্তি জন্য জীবের গ্লানি কি ?"

"ভ্রান্তি যদি গেল, তবে জীবের বাঁচিবার প্রয়োজন রইল কই ?"

"একভ্রান্তি হ'তে আর এক ভ্রান্তিতে যেতে হবে। জীবনই ভ্রান্তি।"

"তা হ'লে ভ্রান্তি হতে মুক্তিলাভ জীবের অসাধ্য ?"

"অসাধ্য নয়, কষ্টসাধ্য। ভ্রান্তি, মুক্তি উভয়েই জীবের আনন্দ আছে। ভ্রান্তির আনন্দ নশ্বর, মুক্তির আনন্দ অবিনশ্বর। অবিনশ্বর আনন্দ হলে ত সে আনন্দময়ই হয়ে যায়, তখনত জীব থাকে না, আনন্দই হয়। ভ্রান্তির আনন্দই প্রেম, মুক্তির আনন্দে প্রেমেরও সত্ত্বা থাকে না। প্রেম যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন আপন সত্ত্বা লুপ্ত করে, আনন্দে ডুবে যায়। সেও মুক্তি লাভের একটা উপায়।"

"আমি এখন কি করবো ?"

"প্রেমেরই সাধনা কর, তাহাতেই তোমার অধিকার। তাই নিয়াই তোমার কর্ম্মের সূত্রপাত।"

ঠাকুর রোগীর শির হইতে করতল উত্তোলন করিলেন, রোগী অসাড় অজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

বক্তা—সতীশ চন্দ্র।

সুস্থ প্রকৃতির বিজয় কুমার সরল নির্ভয়ের কণ্ঠে আসিয়া বলিলেন, "আমি মাধবীকে শাস্ত্রবিধিমতে বিবাহ করিব, আপনি তার ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

আমি ভাবিলাম, শাস্ত্রবিধি আবার কি? এতটা টান হেঁচড়ার পরে আবার গোটাকতক সংস্কৃত মন্ত্রসূত্রের কি প্রয়োজন। বলিলাম, "বিবাহটা তবে গন্ধর্ব্ব মতে হোক্, প্রজাপত্য বিধিতে নাই বা হোল।"

বিজয় বলিলেন, "না তা হবে না। পুরোত ডেকে, শালগ্রাম সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করে সম্প্রদান কর্ত্তে হবে।"

"সম্প্রদান আবার কে করে বলুন! মাধবী নিজেইত নিজেকে সম্প্রদান করে আছে।"

বিজয় আনন্দের হাসি হাসিল। বলিল, "বর খুঁজিতে এত কষ্ট স্বীকার কর্ল্লেন, একজন সম্প্রদাতা খুঁজিবার কষ্টটুকু স্বীকার করবেন না? যতদিন তা না হয়, ততদিন আমি আপনার এখানেই থাক্‌বো। এর পূর্ব্বে আমি আর মাধবীর কাছে যেতে চাই না।"

তাহাই হইল। বিজয় আমার এখানেই থাকিয়া গেল। আমি খুঁজিয়া মাধবীর পিতার একজন জ্ঞাতি পাইলাম। তিনি অত বড় সাগর ফেরতা ধাড়ী মেয়ে সম্প্রদান কর্ত্তে শাস্ত্র ধর্ম্ম ও সমাজের ভয় পাইলেন। তাঁহার সে ভয় ভাঙ্গিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। এক জোড়া ঢাকাই ধুতি চাদর ও কিছু রজত দক্ষিণা দিয়াই সহজে কার্য্যোদ্ধার হইল।

ফাল্গুনে দিন স্থির হইল। কন্যা কর্ত্তা আমি স্বয়ং, বর কর্ত্তা হইলেন মিষ্টার কর। কর সাহেব আসিয়া বলিলেন, "দেখুন মশাই। আজ কালকার বাজারে শুধু হাতে ভগিনীর বিবাহ দেওয়া চলিবে না, বাজার মত বরের মূল্য দিতে হইবে। যৌতুকাদির কথা আগে পাকা পাকি হওয়াই ভাল।"

আমি বলিলাম, "কন্যার ঘরের দিকে চাহিয়া কথাটা বলিবেন। কত বড় কুলীনের মেয়ে, তাত জানেন। গোষ্ঠিপতি হলেও বর মৌলিকের ঘরে। ঘরের মান কিন্তু খোয়াতে পারবো না।"

অনেক বুঝাইয়া বলিয়া কহিয়া মাকে এই বিবাহে যোগ দিতে, বর কন্যা আশীর্ব্বাদ করিতে রাজি করিলাম। তাহা না হইলে মাধবী কান্না ছাড়ে না। বউদিদিরা শুনিয়াই আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন, তাঁহারা কোনও শুদ্ধি অশুদ্ধির কূটতর্ক মানেন না।

পল্লী দেশ হইতে বিজয়ের মামাত ভাই পিশতত ভাই, জ্ঞাতি কুটুম্ব আট দশ জন আসিলেন। শুভ বিবাহ হইয়া গেল। মাধবীটা যে কেমন করিয়া চেলি পরিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া পিড়ির উপর বসিয়া সাত পাক ঘুরিল, তা ভাবিয়া আমি হাসি রাখিতেই পারিলাম না।

বন্যা—মাধবী।

শেষটা আমাকে না বলিলে চলিল না। আপনারা হাসিয়া লজ্জা দেবেন না। কর দিদি আমাকে যা লজ্জা দিয়াছিলেন, তা যখন সইতে পারিয়াছি, তখন হাসি টিটকারী আমি খুবই খাইতে পারি। যদি প্রাণভরা আনন্দ থাকে, তবে আঘাতে বড় ব্যথা লাগে না।

স্বামীকে বলিলাম, "চল দেশে যাই, আর এ সহরের ভিড় ভাল লাগে না।"

তিনি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ। দেশ আবার কোথায়?"

"কেন সেই পল্লীর বাড়ীতে, আমি ত সে বাড়ী দেখে এসেছি।"

"সেখানে গিয়ে কিরূপে চল্‌বে?"

"ভালই চল্‌বে। সে ত সোণার দেশ। অত বড় বাস্তখানার ভিতরেই দু'জনের অন্ন বস্ত্র চল্‌তে পারে।"

"তোমার ব্যবসাত সেখানে চল্‌বে না। পাড়া গাঁয়ের পুরুষ ডাক্তারকেই টাকা দেয় না।

"ব্যবসা আর করবো না; বিদ্যা ফলাতে হয়, সেই পল্লীর সেবারই বিদ্যার সার্থকতা করবো। ডাক্তারি আর করবো না, ডাক্তারের অত্যাচার হইতে রোগীদিগকে বাঁচাবার উপায় করবো। আমি একটা কথা মোটেই বুঝ্‌তে পারি না যে, ডাক্তারের যত নাম পশার বাড়ে, ফি তার তত বেড়ে যায়। নাম পশার বাড়্‌লে ফিত আরও কমে যাওয়া উচিত। দিনে একটা কল পেয়ে, চার টাকা না হলে দিন চলে না। দিনে যদি দশটা কলই মিলে, তবে এক টাকা হলেই বা দোষ

কি ? আমরা সাগর পাহাড় ত অনেক ঘুরলাম, কাজ ত কিছুই কর্ল্লাম না। পল্লীর ভিজা মাটীতে ছায়ায় ব'সে, একটু আরাম করিগে চল।"

"পল্লীতে বড় ম্যালেরিয়া :"

"চল, সেই রাক্ষসীর সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে। ম্যালেরিয়ার ধ্বংসের এক মাত্র উপায় পেট ভরে খাওয়া, আর মুক্ত বাতাসে বেড়ান। এখনও হাজার পাঁচেক টাকা আমার আছে। সেই টাকা নিয়েই অন্ততঃ সেই গ্রাম থেকে ও রাক্ষসীটাকে আমি তাড়াতে পারবো। নেহাৎ না পারি, দশ জনের সাথে আমরাও মরবো। তবুত বীরের মত রণে মৃত্যু হ'বে। এ-ইট পাথরের মধ্যে মরেও সুখ হয় না।

বক্তা—বিজয় সিংহ।

শেষটায় আমাকেও একটু বলিতে হইল। গোটা দুই বৎসর পল্লী গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া পুরাতন স্মৃতিগুলি ভুলিয়া ফেলিয়াছি। সেগুলি এখন আর ডাকিয়া না আনিলে সাধিয়া আসিয়া মনের মধ্যে ভিড় পাকাইয়া বসে না। এ ছায়া-ঢাকা আঁধার পথে এমন কিছুই চক্ষে পড়ে না, যাহাতে সে পুরাণ কথাগুলি মনে ডাকিয়া আনিবে।

দিনও একরূপ বেশ চলে। মাধবী ডাক্তারী করে না, কিন্তু চিকিৎসা করে। পাঁচ গ্রামের মধ্যে রোগ হইলে তাহাকে পাইতে আর কাহাকেও বড় ডাকে না। আর আমাদের বাড়ীতে শাক্ সবজি আম কাঁটাল, নারিকেল কদলী, দুধ, খেজুর রস, গুড়, চিড়া, মুড়ি প্রায়ই আসে, হিসাব করিয়া দেখিলে ইহাতে মাধবীর প্রায় দৈনিক গোটা

দুই টাকা আয়। আর প্রণামী কাপড়ের সঙ্গে হাড়ি হাড়ি বাতাসা সন্দেশও আসে। মাধবীর ছেলে মেয়ে, দিদি বোনটীর অভাব নাই।

আমিও বসিয়া থাকি না। প্রথমে নিজ বাস্তু বাড়ীটার জঙ্গলগুলি কাটাইয়া কোদলাইয়া কৃষি আরম্ভ করিলাম। চারি পার্শে তিন শ নারিকেল গাছ পুঁতিয়াছি, মধ্যে আলু কপি পটল বেগুনের ক্ষেত। নারিকেল গাছগুলি এই দু'বৎসরেই বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, দেখিলে বড় আনন্দ লাগে। আমার সবজি বাগ দেখিয়া পল্লীবাসীর তাহাতে প্রলোভন আসিয়াছে। চার পাঁচটা গ্রামের যুবকদল ডাকিয়া একটা সমিতি গড়িলাম, স্থির হইল গ্রামের সমস্ত জঙ্গল আগাছা কাটিয়া সাফ করিব। পরে তাহাতে মরসুম মত ফসলের চাষ করিব। খরচ সমস্তই সমিতি হইতে দেওয়া হইবে। ফসল উঠিলে বিক্রয় করিয়া, টাকায় বৎসরে এক আনা হিসাবে সমিতির টাকা শোধ দেওয়া হইবে। সমিতিতে প্রথমে মাধবী হাজার টাকা জমা দিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে গ্রাম শবজি বাগের হরিৎ শোভায় সুশোভিত হইল। উপযুক্ত সার ব্যবহার করায় শস্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ ফলিতে লাগিল। পল্লীবাসী বুঝিল, কামধেনু পল্লীরাণী, চাহিলেই সুধা দান করে।

পেট ভরিয়া ক্ষেতের শস্য খাইয়া, পরিস্কার রোদ-বাতাস-খেলা গ্রাম্য রাস্তায় ঘুরিয়া পল্লীবাসী স্বাস্থ্য-সুন্দর হইয়া উঠিল। ম্যালেরিয়ায় নাশ না হইলেও শক্তি খর্ব্ব হইল। আপনার সেবা সর্ব্বস্ব না ভাবিয়া পরের সেবায় মন দিলে আনন্দ অসীম, তাহা বুঝিলাম। ভাবনা এখন শকুন্তলাকে লইয়া, তাহার এই দশ বৎসর বয়স, ষোল পা হইতে আর কতই বা দেরী। মাধবী বলে, যে শকুন্তলা গড়তে পারে, একটা দুষ্মন্ত গড়তে তার আটকায় না।

সম্পূর্ণ।